# ফুটলো কুসুম

বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ও কোরীয় দার্শনিকদের সহিত দ্বন্দ্বের ফলে কোরিয়ার পুরাতন সাহিত্য সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়। কেবলমাত্র দু'খানি পুস্তকের উদ্ধার হয়েছে, তার মধ্যে একখানি "(শুকনো বনে) ফুটলো কুসুম।"

কোরীয় উপন্যাস
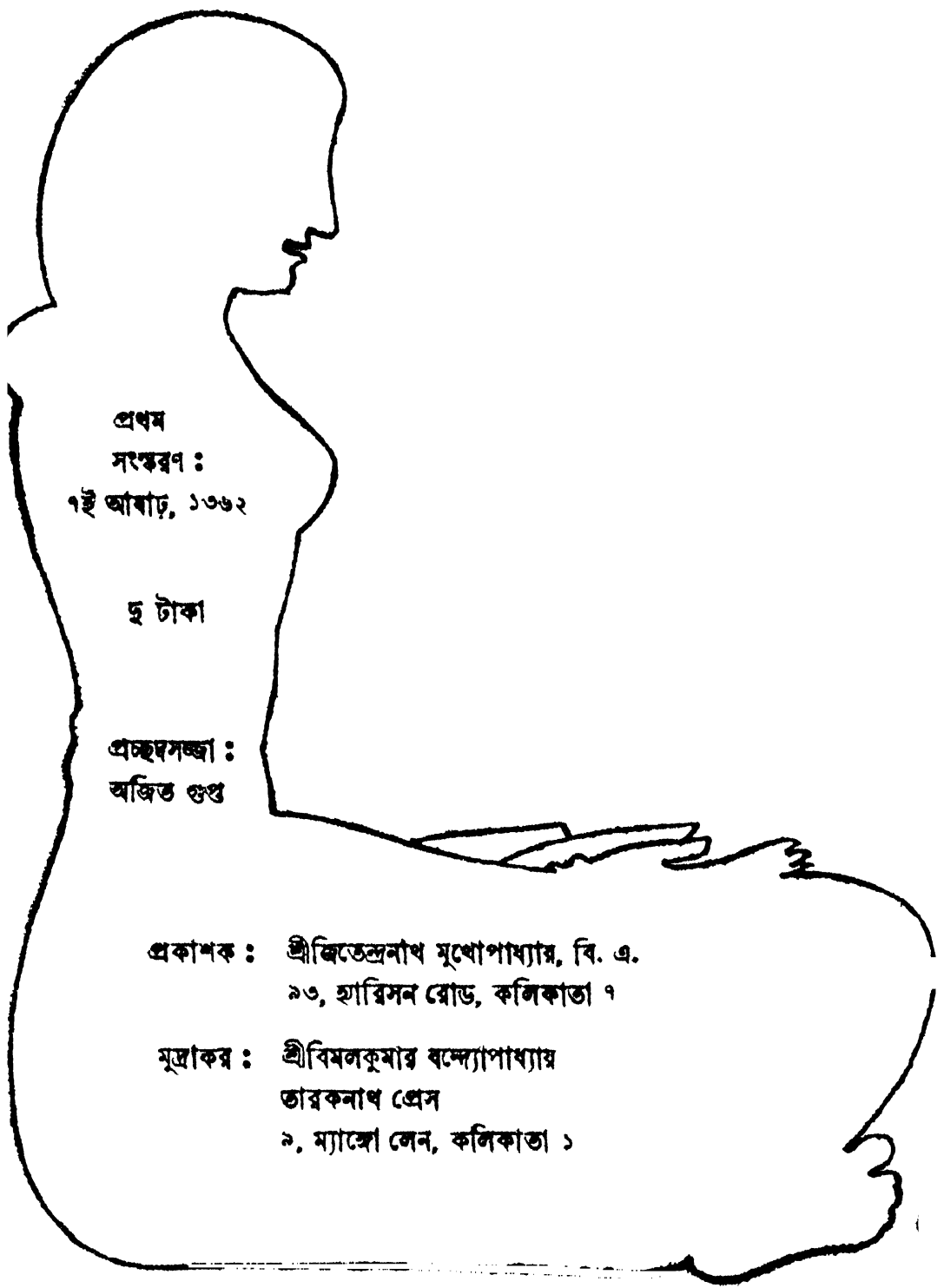
মূল হইতে ফরাসী ভাষায় অনুবাদ :   হং-জীয়ং-য়ু

বাংলা অনুবাদ :   রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ

৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

প্রথম
সংস্করণ :
৭ই আষাঢ়, ১৩৬২

দু টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীবিমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
তারকনাথ প্রেস
৯, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা ১

# উৎসর্গ

মুকুল,

তুই যোধপুরে বসে আমার অনুবাদ পড়ে
আনন্দ পাবি, তাই এই অনুবাদ তোকেই দিলাম।
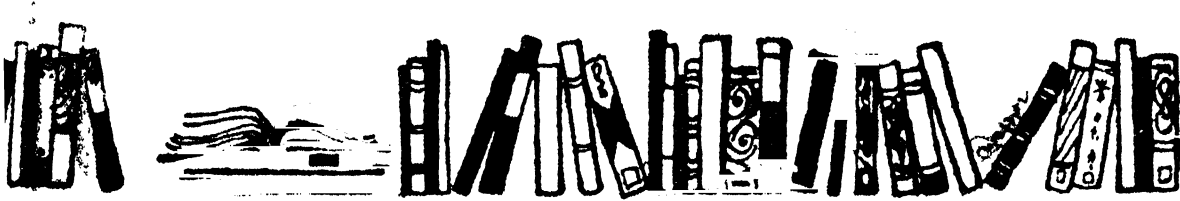
# Le Bois Sec Refleuri

[ শুকনো বনে ফুটলো কুসুম ]

## কোরীয় উপন্যাস

[ মূল হইতে ফরাসী ভাষায় অনুবাদ ]

হং-জীয়ং-য়ু

# কোরিয়ার প্রাচীন ইতিহাস

[ খৃঃ পূঃ ২৩৫৪ অব্দ – ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ ]

কোরিয়া নামটি সম্ভবতঃ মার্কো-পোলো প্রথম ইউরোপে পরিচিত করেন। যে সময়ে মার্কো-পোলো রাজা কুবলাই খাঁর সভায় ছিলেন, সে সময় "কোরিয়া" বলতে বোঝাতো একটি ছোট দ্বীপ। ইউরোপের লোকেরা কোরিয়া বলতে বুঝতো এই ক্ষুদ্র দ্বীপটিকেই। পঞ্চদশ শতাব্দীতে নানা ঘটনার ফলে এই দ্বীপটির নাম হলো "শীও-শেন" ( Tcio-Shen )। কোরিয়ার লোকেরা তাদের দেশকে এখনও "শীও-শেন" বলে থাকে।

আশ্চর্যের কথা এই যে, সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত মানচিত্রে একটি দ্বীপকেই কোরিয়া বলে অভিহিত করা হচ্ছে। এই অজ্ঞতার কারণ হয়তো এই যে, কোরিয়াবাসীরা বাইরে নিজেদের প্রকাশ করতে চাইতো না। এলিশে রেক্লু ( Elisée Reclus ) বলেন, "চলিত এক প্রথা অনুযায়ী কোরিয়াবাসীরা চাইতো যে, বিদেশ কোরিয়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ থাক।"

রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে কোরিয়াকে বলকান উপদ্বীপের সঙ্গে তুলনা করা যায়। কারণ বলকান উপদ্বীপের মতই কোরিয়াকে ঘিরে রয়েছে কতকগুলি শক্তিশালী অন্য শক্তি। তার মধ্যে একটি হচ্ছে জাপান আর একটি হচ্ছে চীন। উভয়েই বহুবার কোরিয়ার উপর নানা উপায়ে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করবার

চেষ্টা করেছে। তৃতীয় হচ্ছে রুশিয়া। বর্তমানে মুখ্যভাবে না হোক, অন্ততঃ পরোক্ষভাবেও রুশিয়া কোরিয়ার একাংশের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে।

কোরিয়ার ইতিহাসকে নিম্নলিখিত পাঁচটি ঐতিহাসিক যুগে ভাগ করা যায় ঃ

## প্রথম যুগ

প্রথম যুগ হচ্ছে কিংবদন্তীর যুগ। সে যুগ আরম্ভ হয় যীশুখৃষ্টের জন্মের ২৩৫৪ বছর আগে। ইয়াও ( Yao ) যেদিন চীনের সম্রাট হলেন, তার ছয় মাস পরে এক সাধু এসে বাস করতে আরম্ভ করেন তাইয়াকু ( Taihakou ) পাহাড়ের উপর। সাধুর শিষ্য জুটতে দেরী হলো না। ক্রমশ দেশের লোকেরা সাধুকে সম্রাটের সম্মান দিতে লাগলো। এই সাধু-সম্রাট এক হাজার ছ'শো আটষট্টি বছর পর স্বর্গে যাবার জন্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কোরিয়া দেশের লোকেরা এই সাধুকে তানকু ( Tankou ) বলে ডাকতো।

এই কিংবদন্তীর মধ্যে যে কতটুকু সত্যি আছে তা বলা যায় না, তবে চু-কিং-এর একখানি ধর্মপুস্তক থেকে পাওয়া যায়— "সম্রাট ইয়াও তাঁর একজন সভাসদ্ 'ঘী-শীউ'কে ( Ghi-Tchiou ) হুকুম করলেন, তাঁর রাজধানীর পূর্বে এক পাহাড়ের উপর গিয়ে অবস্থান করতে। মনে হয়, এই পাহাড়ের উপর থেকে সূর্যদেব ওঠেন, এবং 'ঘী-শীউ'র উপর ভার পড়েছিল তাঁর প্রভুর হয়ে প্রতি প্রত্যূষে সূর্যদেবকে প্রণাম করা। যে পাহাড়ের উপর গিয়ে ঘী-শীউ বাস করতে থাকলেন, সে পাহাড়ের অবস্থান দেখে মনে

হয় সেই পাহাড়ই তাইয়াকু পাহাড় এবং কিংবদন্তী ঘী-শীউকে তানকু ( Tankou ) নামে বাঁচিয়ে রাখে।

## দ্বিতীয় যুগ

এইবার আরম্ভ হলো কোরিয়ার সত্যিকারের ঐতিহাসিক যুগ। এই সময় থেকে উপদ্বীপটি সত্যিকারের একটি রাজ্য বলে গণ্য হতে থাকলো। ভূ-ওয়াং ( Wou-Wang ) নামে এক রাজপুত্র চ্যাং ( Chang ) বংশের শেষ রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, ফলে রাজার পতন হয় ও কিছুদিন পরে তাঁর মৃত্যু হয়। নূতন রাজার চরিত্র ভাল ছিল না। রাজার ঘী-শী ( Ghi-Si ) নামে এক কাকা ছিলেন। ঘী-শী নতুন রাজার তাঁবে থাকতে চাইলেন না। নূতন রাজাও ভাবলেন ঘী-শীকে তাঁর রাজ্যে রাখলে বিপদ আছে, কারণ ঘী-শীর প্রভাব তাঁর প্রভুত্বের উপর ছায়াপাত করতে পারে। ভূ-ওয়াং ঘী-শীকে একটি দেশ অর্পণ করে নিজেকে তাঁর হাত থেকে মুক্ত করলেন। পরে এই দেশটির নাম হলো কোরিয়া। খৃঃ পূঃ ১১২২ সালে কয়েকজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে ঘী-শী গেলেন তাঁকে দেওয়া দেশে বাস করতে এবং দেশের তিনি হলেন সত্যিকারের সর্বশক্তিমান রাজা। চীনা সভ্যতা প্রবেশ করলো সেই সময় থেকে এই উপদ্বীপে এবং ঘী-শীর প্রভাবে দেশটিরও ক্রমশ উন্নতি হতে থাকলো।

একজন চীন দেশীয় ঐতিহাসিক কোরিয়া সম্বন্ধে বলেন ঃ

"সে দেশে চোরের ভয় ছিল না। দেশরক্ষার কাজ এমন সুনিপুণভাবে হতো যে, রাত্রে গৃহের দরজা বন্ধ করবার প্রয়োজন হতো না। সারা দেশের উপর ঘী-শীর আধিপত্য ছিল। সুতরাং খী-শীই ছিলেন কোরিয়া রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।"

ঘী-শী যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করলেন, সেই রাজবংশ এক হাজার বছর রাজত্ব করেছিল। সত্যি কথা বলতে কি, সে বংশের আধিপত্য ছিল কেবল উত্তর কোরিয়ার উপর। দক্ষিণ কোরিয়া তখন পরিচিত ছিল "শীম" নামে এবং তখনও সে দেশের বন্য অবস্থাই ছিল। ঘী-শী বংশের ৪১শ বংশধর ঘী-জুন (Ghi Joun) নিজেকে সারা উপদ্বীপের রাজা বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু চীন দেশীয় এক রাজকুমার ঘী-জুনেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। ঘী-জুন আশ্রয় নিলেন কোরিয়ারই এক অংশে। এই অংশটি পূর্বে কোরিয়া রাজ্যের অন্তর্গত ছিল না। ঘী-জুন যেখানে গিয়ে আশ্রয় নিলেন, সেখানে তাঁর অবস্থা খারাপ হলো না, কারণ চীন থেকে বহু লোক এসে তাঁর প্রজা-সংখ্যা বৃদ্ধি করতে লাগলো। সেই সময়কার চীন সম্রাট্ শীন-শী হুয়াং-তী চীনের বিরাট প্রাচীর তৈরী করবার খরচ জোগাবার জন্যে প্রজাদের উপর অতিরিক্ত কর চাপান, সেই কারণে অনেক প্রজা দেশত্যাগী হয়ে কোরিয়ায় এসে বসবাস করতে থাকে।

বিজয়ী ইয়েয়ী-মান (Yei-Man) উত্তর কোরিয়ার সম্রাট্ বলে নিজেকে ঘোষণা করলেন। তাঁর মরবার পর তাঁর পুত্র সিংহাসন পান, কিন্তু তাঁর পৌত্র ইউ-কিও (You-Kio) বেশী দিন রাজত্ব করে যেতে পারলেন না। চীনের হন (Han) বংশের চতুর্থ বংশধরের দ্বারা আক্রান্ত হ'য়ে তিনি সর্বস্বান্ত হলেন। এই শেষোক্ত সম্রাট ছিলেন অভূতপূর্ব ক্ষমতাশালী। তিনি হুনদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের পশ্চিম দিকে বহুদূর হটিয়ে দেন। এই রাজার রাজত্ব ক্যাস্পীয় সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হ'য়েছিল।

৭২ বছর পর কো-শু-মো (Co-Show-Mo) নামে এক বিদেশী উত্তর কোরিয়ায় এসে বাস করতে লাগলেন এবং নিজেকে ক্রমশ উত্তর কোরিয়ার রাজা বলে প্রচার করতে থাকেন।

## তৃতীয় যুগ

কো-শু-মো'র রাজত্ব থেকে কোরিয়ার ইতিহাসের তৃতীয় যুগ আরম্ভ হয়। কো-শু-মো'র বংশ কোরিয়ার উপর ৮০০ বৎসর রাজত্ব করেন। তারপর সম্ভবতঃ সাইবেরিয়ার পূ-ইউ বংশ কোরিয়া জয় করেন। পুরাতন ভৌগোলিকদের গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যায়, পু-ইউদের রাজ্য ছিল চিও-সেনের ১০০০ রী দূরে অবস্থিত। (১ রী = ৪০০ মিটার। এক মিটার = ১˚০৯৩৬৩৩ গজ)। এ দেশটি ছিল অসভ্য দেশ। কো-শু-মোর জন্ম সম্বন্ধে নানা প্রকারের গল্প আছে।

পূ-ইউ রাজ্যের রাজার একদিন সাক্ষাৎ হয় জলদেবতার কুমারী কন্যার সঙ্গে। তিনি তাঁকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যান এবং সেখান থেকে দেবকন্যাকে আর বা'র হতে দেন না। কিছুকাল বিদেশ ভ্রমণ করে ফিরবার পর রাজা দেখলেন রাজকন্যা মা হতে চলেছেন। তিনি ঠিক করলেন, তাঁকে বধ করবেন, কিন্তু বধ করবার পূর্বে দেবকন্যাকে তিনি কয়েকটি প্রশ্ন করেন। উত্তরে দেবকন্যা বলেন, "ঘরের ভিতরে সূর্যের আলো এসে আমার শরীরের উপর শাণিত ছুরি মত পড়ছিল। সেজন্যে আমি ধীরে ধীরে পিছু হঠতে থাকি। কিন্তু সূর্যের আলোও আমার পিছু পিছু আসতে থাকে। সেইদিন থেকে আমি অন্তঃসত্ত্বা হয়েছি।" এই অদ্ভুত উত্তর মেয়েটির প্রাণরক্ষা করলো। রাজা তাকে প্রাণে মারলেন না। শীঘ্রই দেবকন্যা এক সন্তানের জন্ম দিলেন। ছেলেটি অতি দক্ষ ধানুকী ছিল বলে, তার নাম হলো শু-মো (Shou-mo)। শু-মোর গুণ দিন দিন বাড়তে থাকলো। তার গুণে বহুলোক ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে তাকে হত্যা করবার চেষ্টা করায় শু-মো দক্ষিণ দিকে "কুরে" (Koure) নামক এক স্থানে পলায়ন করে। সেখানে তিনি রাজা হ'য়ে বসেন এবং নিজের বংশের নাম দেন "কো"। প্রথম তিনি

তাঁর রাজ্যের নামকরণ করেন “কো-কুরে” ( Ko-koure )। নামটা ক্রমশ ছোট হয়ে “কোরে” ( Coree )। অর্থাৎ কোরিয়া’য় পরিবর্তিত হয়। এই হলো কোরিয়া নামের ইতিহাস।

পু-ইউ রাজ্য ত্যাগ করবার পূর্বে শু-মো এক যুবতীর প্রেমে পড়েন। ফলে তার এক সন্তান জন্মে এবং তার নামকরণ হয় রুই-রী ( Roui-Ri )। বড় হ’য়ে পুত্র যখন জানলো তার মার কথা, তখন সে চললো মায়ের সঙ্গে দেখা করতে তার জন্মস্থানে। কোরিয়া দেশে তখন বহু বিবাহের প্রচলন ছিল কি না, ঠিক করে বলা যায় না। শু-মো তাঁর স্ত্রীকে পেয়ে আবার হারিয়েছিলেন কিনা বলা যায় না, তবে এটুকু জানা যায় যে, শু-মো পু-ইউ রাজ্যের রাজার মেয়েকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। এই দ্বিতীয় বিবাহের ফলে তাঁর দুটি সন্তান জন্মায়। প্রথমটির নাম ফুৎসু রিয়েউ ( Foutsou-Rieou )। দ্বিতীয়ের নাম উশো ( Ousho )। রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে প্রথম পক্ষের সন্তান রুই-রী। অন্য দুজন রাজকুমারের ভয় হলো সৎ ভাই রুই-রী হয়তো তাদের উপর অত্যাচার করবে। সুতরাং দুজনেই পলায়ন করলেন। ফুৎসু-রিয়েউ কোরিয়ার দক্ষিণাংশে একটি স্থানে আশ্রয় নেবার চেষ্টা করলেন। এই স্থানটি তিনটি রাজত্বে বিভক্ত ছিল, তার মধ্যে সর্বপ্রধান হচ্ছে “কাম” ( Kam )। “কামের” সঙ্গে শীম ( Shim ) দেশের অনেকটা মিল আছে ( ঘী-জুন সম্বন্ধে বলবার সময় আম বা শীমের উল্লেখ করেছি )। ঘী-জুন এদেশে এসে দক্ষিণ দিকে একটি দ্বীপে বাস করতে থাকলেন। ক্রমশ তিনি নিজেকে সারা দেশটির রাজা বলে প্রচার করলেন। তিনটি রাজ্যের নাম ছিল বা-কাম, বেন-কাম ও শীন কাম—এই তিনটি দেশ মিলিয়ে হলো শীম রাজ্য। ঘী-জুন হলেন এই রাজ্যের প্রথম রাজা। তার পুত্রেরা বংশপরম্পরায় দুই শত বৎসর রাজত্ব

করেন; যখন ফুৎস্থ-রিয়েউ ও তার ভাই এদেশে এলেন, তখন রাজা তাঁদের সাদরে অভ্যর্থনা করলেন, এমনকি রাজা তাঁদের উপহারস্বরূপ দিলেন এক প্রকাণ্ড জমিদারী।

ফুৎস্থ-রিয়েউ অকালে মারা যান এবং তার ভাই উ-শো কিছুকাল অজ্ঞাতভাবে বেঁচে থাকেন। কিছুদিন পরে তিনি ক্রমশ লোকের প্রিয় হ'য়ে ওঠেন এবং বা-কাম রাজ্য আক্রমণ করে সারা দেশের রাজা হ'ন। এমনিভাবে ঘী-জুনের বংশ লোপ পায়। উ-শো তাঁর রাজ্যের নাম দিলেন কুতারা।

কোরিয়ার দক্ষিণদিকের আর তুটি দেশের নাম বেন-কাম ও শীন-কাম। প্রত্যেকটি দেশে বারোটি করে উপজাতি বাস করতো। আমরা আগেই বলেছি যে, করের ভয়ে চীনদেশ থেকে বহু লোক কোরিয়ায় এসে বাস করতে আরম্ভ করলো। ফলে কোরিয়ার পূর্ব-দিকে আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে চীনা রক্তের সংমিশ্রণ হ'লো।

শীন-কামের বারোটি উপজাতির মধ্যে সর্বপ্রধান জাতি হ'লো শীনরা ( Shinra )। এই শীনরা বংশে জন্ম হ'লো বীর কোকু-কিও-শেয়ী'র ( Koku-Kyo-Shei )। ক্রমে শীন-কামের লোকেরা তাঁকে রাজা বলে মেনে নিয়ে তাঁর নাম দিলেন শেই-কিও-খাঁ ( Shei-Kyo-Khan )। কোরিয়ার ভাষায় Khan মানে হচ্ছে প্রবল পরাক্রান্ত তাতার—অর্থাৎ রাজার রাজা। শীন-কামের উপর একাধিপত্য পাবার পর শেই-কিও-খাঁ বেন-কাম দখল করলেন। সেই দিন থেকে কোরিয়ার ইতিহাসের পাতা থেকে শীন-কাম ও বেন-কাম নাম তুটি লুপ্ত হলো। তখন সকলে জানলো তিনটি নাম শীনরা, কোরিয়া ও কুতারা।

শেই-কিও-খাঁর নবম উত্তরাধিকারীর রাজত্বকালে শীনরাদের উস্কানিতে জাপানের পূর্বভাগের লোকেরা বিদ্রোহী হ'য়ে উঠলো।

জাপানের সম্রাট সম্রাজ্ঞীকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন বিদ্রোহীদের দমন করতে। সম্রাট মারা গেলেন, কিন্তু সম্রাজ্ঞী শীনরাদের শাস্তি দিতে ছাড়লেন না। তিনি বিরাট নৌবহর সংগ্রহ করে নামলেন শীনরাদের দেশে এবং রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। রাজা কিন্তু রাণীর রূপে মুগ্ধ হ'য়ে ভাবলেন—তার চোখের সামনে স্বয়ং স্বর্গের দেবী নেমে এসেছেন। তিনি রাণীর সম্মুখে নতজানু হ'লেন। কোরিয়ার অন্য সকল রাজা ও কুতারার রাজাও এলেন রাণীর পায়ে তাদের ভক্তি অর্ঘ দিতে। এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করে রাণী দেশে ফিরলেন (খৃঃ পূঃ ২০০ বৎসর)।

সেইদিন থেকে কোরিয়া আর জাপানের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হ'লো। চীন দেশের সভ্যতা সম্বন্ধে জাপান তখন কিছুই জানতো না, কোরিয়ার মারফৎ জাপান চৈনিক সভ্যতার প্রভাব কিছু কিছু পেতে আরম্ভ করলো; বিজ্ঞান, কলা, ব্যবসায়, এমন কি ধর্মমত পর্যন্ত জাপান তার প্রতিবেশীর কাছ থেকে আমদানী করতে লাগলো। ইউরোপের উন্নতির মূলে গ্রীস ও রোম যে কাজ করেছে, জাপানের সভ্যতার মূলে কোরিয়া ও চীন ঠিক সেই রকম কাজ করছে।

৬ষ্ঠ ও ৭ম খৃষ্টাব্দে বলবার মত ঐতিহাসিক ঘটনা কোরিয়ায় কিছু ঘটেনি। সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি কুতারার রাজা শীনরাদের রাজ্য আক্রমণ করেন। এই সময় কুতারা চীনের সাহায্য নেয়। কোরিয়া ও শীনরা জাপানের শরণ নেয়। যুদ্ধের ফলে কোরিয়ার অনেকটা অংশ চীনের অধীনে এলো। কিছুকালের জন্য কোরিয়া নামটি বিলুপ্ত হ'লো।

১০ম শতাব্দীর মাঝামাঝি শীনরাদের রাজ্যের চারদিকে বিদ্রোহ আরম্ভ হলো। যে কেউ সুবিধা পেলো সে-ই নিজেকে রাজা বলে জাহির করতে লাগলো। এই সময় ও-কেন (O-Ken) নামে এক

ব্যক্তি নিজের প্রতিপত্তির বলে কোরিয়ায় এক নূতন রাজ্য স্থাপন করলো ( খৃঃ ৯৩৫ )।

## চতুর্থ যুগ

ও' ( O ) বংশের রাজত্বকাল থেকে আরম্ভ হ'লো কোরিয়ার ইতিহাসের চতুর্থ যুগ। ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে চেংগিজ খাঁর আক্রমণে কোরিয়ার উপর চীনের আধিপত্য টলমল করলো। সপ্তম শতাব্দীতে কোরিয়ার যে অংশটুকু চীনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, চেংগিজ খাঁ সেটুকু জয় করে নিয়ে তাহা ও' রাজবংশের হাতে তুলে দিলেন। ফলে ও' বংশ প্রায় সারা কোরিয়ার উপর রাজত্ব করতে লাগলো।

চেংগিজ খাঁর পৌত্র কুবলাই খাঁ চাইলেন জাপান তাঁর আধিপত্য মেনে নিক। জাপান রাজী হ'লো না। উপরন্তু কুবলাই খাঁর প্রেরিত দূতকে সম্রাটের হুকুমে হত্যা করা হ'লো। কুবলাই খাঁ কোরিয়ার সাহায্যে বিরাট নৌ-শক্তি জড় করে জাপান আক্রমণ করতে চললেন। তিনি কয়েকটি দ্বীপ জয় করে জাপানের দক্ষিণ দিকে এসে হাজির হ'লেন। জাহাজগুলিকে পরস্পরের সহিত শিকলের দ্বারা সংযুক্ত করে সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলেন। এমন সময় উঠলো ভীষণ টাইফুন। ফলে কুবলাই খাঁর নৌবহরের সর্বনাশ হ'য়ে গেল। জাপান বেঁচে গেল ( খৃঃ ১২৮১ )।

কুবলাই খাঁর বংশ চীনে বেশি দিন রাজত্ব করতে পারলো না। মিং বংশের হাতে, একশত বৎসরের মধ্যে সিংহাসন ছেড়ে দিতে হ'লো। কোরিয়ার ও-কেন বংশের ভিতেও ভাঙ্গন ধরেছিল। বংশের উত্তরাধিকারী স্বেচ্ছায় সিংহাসন ছেড়ে অজ্ঞাতভাবে বাস করতে

লাগলেন। লী-শেই-কেই (Li-Shei-Kei) নামে এক সেনাপতি রাজা উপাধি নিয়ে ১৩৯২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করলেন।

## পঞ্চম যুগ

১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে সারা উপদ্বীপটির রাজা লী কোরিয়ার নামকরণ করলেন টী-ও-শেন (Tei-O-Shen) এবং চীনের সঙ্গে সন্ধি করলেন। এমনিভাবে চীনের সঙ্গে একটা নিবিড় বন্ধুত্ব স্থাপিত হলো। এই সন্ধি স্থাপন অদ্ভুত বলে মনে হয়, কিন্তু এরূপ সন্ধির কারণ হ'চ্ছে ঃ

সিংহাসনে বসবার পূর্বে, লি-শেই-কেই, চিও-হাকু (Tcio-Hakou) নামে এক পাহাড়ে একটি দেবমন্দিরে অজ্ঞাতভাবে বাস করতে থাকেন। এই পর্বতমালা উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়াকে দুটি ভাগে ভাগ করেছে। এই দেবালয়ে চু-য়ুয়ান-চাং (Tchou-Youan-Tchang) নামে এক যুবক বাস করতো এবং এই যুবকই চীন দেশে মিং বংশের স্থাপনা করেন। দশ বছর এই দুইজন ভাগ্যবান পুরুষ পাশাপাশি বাস করেলন কিন্তু একটি কথাও কেউ কারো সঙ্গে বলেননি। চু-য়ুয়ান-চাং প্রথমে দেবালয় ছাড়লেন, যাবার সময় বন্ধুকে বলে গেলেন, "এই পাহাড়ের দক্ষিণে যে দেশ বিস্তৃত রয়েছে, একদিন আপনি সেই দেশের রাজা হ'বেন"—এই বলে তিনি চলে গেলেন। এতদিন যারা দুজনে পাশাপাশি রইলেন, তাদের মধ্যে আজ গভীর বন্ধুত্ব স্থাপিত হলো।

কোরিয়ার ইতিহাসে যে সময়ে আমরা এসে উপস্থিত হ'য়েছি, সে সময়ে জাপানে রাজত্ব করছেন ওশি-কাগা (Oshi-Kaga)। রাজ্যময় তখন বিদ্রোহ চলছে। ছোটখাটো দেশগুলি বড় বড় দেশের শিকার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এই সময় এক রাজকুমারের ভৃত্য

হিদে-য়োশি (Hide-yoshi) শিওগুন (Shiogoun) বংশের রাজার হাত থেকে সিংহাসন কেড়ে নিলেন। তারপর দেশের মধ্যে তিনি শান্তি স্থাপন করলেন। কেউই তাঁর আধিপত্যের উপর আপত্তি করতে সাহস করলো না। ক্রমশ তিনি চীন জয় করবার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। তাঁর একটি পুত্র—য.কে তিনি নিরতিশয় ভালোবাসতেন—এসময় মারা যায় এবং হিদে-য়োশি পুত্রশোক ভুলবার জন্যে তাঁর অধীনে যত ছোট খাটো রাজ্য ছিল, সকল রাজ্য থেকে ৫০,০০০ সৈন্য জড় করে বিরাট অভিযান আরম্ভ করলেন। নৌ-বহর কোরিয়ার কূলে এসে পৌঁছলো। কোরিয়া চীনের সাহায্য চাইলো। চীনের সম্রাট লি-জিও-শিওকে অধিনায়ক করে সৈন্য পাঠালেন কিন্তু চীনের সৈন্যদল হেরে গেল। চীনের সম্রাট্ সন্ধি করতে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠালেন শিন-ই-কেইকে। শিন-ই-কেই জাপানের সঙ্গে সন্ধি করলেন। সন্ধির চতুর্থ নিয়মানুসারে হিদে-য়োশিকে রাজমুকুটালঙ্কৃত করা হলো। শিওগুনও এই সন্ধিতে মত দিলেন।

কয়েকজন সৈনিক ও কোরীয় রাজদূত একটি সোণার বাক্স, একটি লাল পোশাক ও একখানি পত্র নিয়ে উপস্থিত হলো। পোশাক পরে হিদে-য়োশি হুকুম করলেন চিঠি পড়বার জন্যে। চিঠিতে লেখা ছিল, "আমি তোমায় জাপানের রাজা বলে স্বীকার করলাম।" মাত্র এই ক'টি কথা! হিদে-য়োশি ভীষণ রেগে গেলেন। তিনি বললেন, "আমার ধারণা ছিল আমায় চীনের সম্রাট্ করবার জন্যে প্রতিজ্ঞা করা হ'য়েছিল, কেবল সেই কারণেই আমি যুদ্ধ বন্ধ করেছি। কে রুখতে পারে আমায়, আমি যদি চীনের সম্রাট্ হতে ইচ্ছা করি? সঙ্গে সঙ্গে কোরিয়ায় যুদ্ধ আরম্ভ হলো। বহু বৎসর যুদ্ধ চললো। হিদো-য়োশি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সৈন্যদলকে হুকুম দিলেন জাপানে ফিরে যেতে। কিছুদিন পর তিনি মারা গেলেন।

হিদে-য়োশি সত্যসত্যই শিওগুন ( Shiogoun ) উপাধি নেননি, তিনি কুয়ান-বাকু ( Kouan-Bakow ) উপাধি ধারণ করেছিলেন। কুয়ান-বাকু বলতে বুঝায় সম্রাটের প্রধান সভাসদ্।

ছয় বছর পরে সম্রাট্ টকুগাভাকে ( Tokougava ) 'শিওগুন' উপাধি দিলেন। টকুগাভা ছিলেন অতিশয় বুদ্ধিমান। তাঁর প্রথম চেষ্টা হ'লো জাপানকে ঠাণ্ডা করা। তিনি কোরিয়া রাজ্যকে জাপানের সঙ্গে সন্ধি করতে বললেন। কোরিয়া রাজী হ'লো। চিও-শেনও সুযোগ বুঝে চীনকে তার সৈন্য সরিয়ে নিতে বললেন। ১৬০৪ সালে কোরিয়া ও জাপানের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো।

সেইদিন থেকে বহুদিন আর উপদ্বীপটিতে কোনরূপ অশান্তি হয়নি। ১৬৬১ সালে গৃহ-যুদ্ধের ফলে চীনে এক নূতন রাজবংশ প্রতিপত্তিশালী হ'লে উঠলো এবং জাপান চীনের আধিপত্যের জোয়াল থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিলে। কোরিয়ার পূর্বে ও পশ্চিমে অবস্থিত রাজ্য দুটি ইউরোপের সঙ্গে আদান-প্রদান শুরু করলো। ১৮৪২ সালে চীনের বন্দর বিলিতী ব্যবসায়ীদের জন্য উন্মুক্ত হলো। জাপান ১৮৫৯ সালে চীনের পদাঙ্ক অনুসরণ করলো। কোরিয়ার কাছেও ইউরোপের প্রার্থনা চলতে লাগলো। কিন্তু যতদিন কোরিয়া চীনের তাঁবে ছিল, ততদিন কোন চুক্তি সম্ভব হয়নি। শেষে পিকিন কোরিয়াকে চুক্তি করতে অনুমতি দিল এবং কোরিয়াকে স্বাধীন রাজ্য বলে মেনে নিল। কোরিয়া প্রথমে ১৮৭৬ সালে জাপানের সঙ্গে এক চুক্তি করে। তারপর কোরিয়ার চুক্তি হয় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ১৮৮৬ সালে। ক্রমশ জার্মাণী, ইংলণ্ড, ফ্রান্স সকলেই নিজের নিজের রাজদূত কোরিয়ায় পাঠাতে লাগলো।

[ এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হং-জীয়ং-য়ু ( Hong-Tjyong-Ou ) নামক এক কোরিয়াবাসীর দ্বারা লিখিত "(শুকনো বনে) ফুটলো কুসুম"

( Le Bois Sec refleuri ) নামক, ১৮৯০ সালে ফরাসী ভাষায় ছাপা একখানি কোরীয় উপন্যাসের মুখবন্ধ থেকে নেওয়া।

এইখানে বলে রাখা দরকার, কোরিয়ার পুরাতন সাহিত্য বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীর ও কোরীয় দার্শনিকদের সহিত দ্বন্দ্বের ফলে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়। কেবলমাত্র দুখানি পুস্তকের উদ্ধার হয়েছে, তার মধ্যে একখানি "( শুকনো বনে ) ফুটলো কুসুম।" ]

# ভূমিকা

[ কোরীয় সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। 'ফুটলো কুসুম' উপন্যাসখানি কোরীয় সাহিত্যের সর্বপুরাতন প্রতীক। বইখানি আসল কোরীয় ভাষা হইতে হং-জীয়ং-উ ( Hong-Tjyong-Ou ) ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন। বইখানি ছাপা হয় ১৮৯৫ সালে, পারীতে।

বইখানির আসল লেখক কে এবং কবে এ বইখানি লেখা হয় তাহা বলা যায় না। তবে গবেষণার ফলে এটুকু জানা গেছে, বইখানি ১৩৯২ সালের পূর্বে নাটক হিসাবে অভিনয় হ'তো। চিও-শেন তৈয়ারী হ'বার সময় বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ও কোরীয় দার্শনিকদের সহিত বিরোধ বাধে। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের জয় হয়। সে সময় কোরীয় দার্শনিকেরা কোরীয় সাহিত্য ( যা'তে বুদ্ধের দর্শনের একটু মাত্র আভাষ ছিল ) সমুদয় নষ্ট করে ফেলে। এই বইখানি কোন রকমে সেই ধ্বংসলীলা থেকে বেঁচে গিয়েছিল। ]

যে সময় পিয়েং ইয়াং কোরীয়ার রাজধানী ছিল সে সময়ে কোরীয়াবাসীদের কাছে, রাজসভার সভাসদদের মধ্যে সুন-ইয়েনের নাম ছিল অতি পরিচিত। সুন-ইয়েন কেবল তাঁর মগজের জোরেই এত উচ্চপদে উঠতে পেরেছিলেন।

সুন-ইয়েন ছিলেন টাকার কুমির, কিন্তু তিনি কাউকে অবজ্ঞা করতেন না। সাহায্যের জন্য কেউ তাঁর কাছে এলে কখনও তিনি কাউকে বিমুখ করতেন না, সেজন্যে সকলেই ছিল তাঁর অনুগত। পরের দৈন্য দূর করা তিনি সৌভাগ্য বলে মনে করতেন। প্রজারা সকলেই তাঁকে ভালোবাসত এবং সকলে ভাবতো, বিপদে পড়লে সুন-ইয়েন নিশ্চয়ই তাদের রক্ষা করবে। সকলে সুন-ইয়েনকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতো।

একদিন কিন্তু সব পরিবর্তন হ'য়ে গেল। এতদিন সুন-ইয়েনের ঘরে লক্ষ্মী ছিল বাঁধা—সে বাঁধা লক্ষ্মী হঠাৎ চঞ্চলা হলেন। সুখী ও ক্ষমতাশালী সুন-ইয়েন হ'য়ে গেলেন সকলের চেয়ে অসুখী ও দরিদ্র।

কি কারণে সুন-ইয়েনের এমন অবস্থা হ'লো, সেই কথাই এবার আমরা বলবো ঃ

কোরীয়ারাজের সভায় ছিল এক বড় উৎসব। নিমন্ত্রিতের মধ্যে ছিলেন দেশ-বিদেশের রাজারা আর রাজসভার স্ত্রীলোকেরা। সভায় ছুটছিল আনন্দ-উৎস—হ'চ্ছিল আনন্দের গান ও সুরে সুর মিলিয়ে বাজনা। সুন-ইয়েনের কানে যখন গেল ঐ উৎসবের কথা, তখন আনন্দ তাঁর মোটেই হ'লো না। বুকের ভিতর তাঁর ভরে উঠলো বিপুল বেদনা। দুঃখ ভোলবার জন্য তিনি গেলেন তাঁর বন্ধু

শান-হুনির সঙ্গে দেখা করতে। শান-হুনি ছিলেন সেই দেশের সবচেয়ে জ্ঞানী লোক। সঙ্গে গেল তাঁর ভৃত্য।

পথ চলতে চলতে তিনি দেখতে পেলেন এক স্থানে লোকের ভিড়। তিনি তাঁর ভৃত্যকে বললেন—"দেখতো ব্যাপার কি!"

প্রভুর হুকুম তামিল করবার জন্যে ভৃত্য ছুটলো···লোকের ভিড় সরে যেতে উন্মুক্ত পথের উপর সে দেখতে পেলো কতকগুলো লোক মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ভৃত্য ছুটতে ছুটতে প্রভুর কাছে এসে সব কথা বল্‌লে।

ব্যাপার শুনে স্নুন-ইয়েন গভীরভাবে আহত হ'লেন। সময় নষ্ট না করে, তিনি একজন পুলিশকে ডেকে পাঠিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন—

"হতভাগারা মরেছে কেন বলতে পারো?"

"পারি হুজুর; ওরা না খেতে পেয়ে মরেছে।"

"ওদের সরিয়ে ফেলা হয়নি কেন, কেনই বা ওদের পথের উপর এমন করে ফেলে রাখা হয়েছে?" স্নুন-ইয়েন তাকে ধমক দিয়ে বললেন।

"আমি এখনি ব্যবস্থা করছি"—এই কথা বলে প্রহরী সেই ভিড়ের দিকে ছুটে গেল।

স্নুনের আর বন্ধুর বাড়ী যাওয়া হ'লো না। তিনি চললেন রাজ-প্রাসাদে, রাজার কাছে।

মহারাজ স্নুন-ইয়েনকে সাদরে সম্বর্ধনা করে বললেন—

"এতদিন তোমার দর্শন থেকে আমায় কেন বঞ্চিত করে রেখেছ, স্নুন?—"

"মহারাজ, আমি বড় একটা বাড়ীর বা'র হই না।"

"এমন করে বাড়ীতে তোমায় কে আটকে রাখে?"

"নয় কাজ, না হয় অসুখ-বিসুখ। আজ আমি মহারাজের কাছে এসেছি তার কারণ, মহারাজকে আমার কিছু বলবার আছে। রাজপথের উপর মহারাজের প্রজারা না খেতে পেয়ে মরে পড়ে রয়েছে—আমি তো প্রথম তা' বিশ্বাসই করতে পারিনি। মহারাজ এ ব্যাপার জেনেও যে উৎসবানন্দে ডুবে থা'কবেন, এ কথা আমার ধারণারও অতীত। কিন্তু মহারাজ, মাত্র কয়েক মিনিট আগে আমি স্বচক্ষে দেখে এলাম, তিনজন লোক অনাহারে মরে পড়ে রয়েছে পথের উপর।"

সুন-ইয়েনের কথায় রাজার মন ভীষণভাবে চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। তিনি ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞেস করলেন—

"তুমি কি করতে বল, সুন? আমি যে বিশ্বাস করতে পারছি না, আমার এই উৎসবানন্দে ভাসমান জীবনই এই ঘটনার কারণ।"

"মহারাজ", সসম্ভ্রমে সুন বললেন, "আপনার আনন্দোৎসবই এ ঘটনার কারণ। কে আপনার এই উৎসবের খরচ যোগায়? আপনারই প্রজা এবং রাজকর্মচারিগণ, তাদের কর্তব্য অবহেলা করে আনন্দ উৎসবে জীবন যাপন করছে। মহারাজ আপনার ভক্ত ভৃত্যের কথা বিশ্বাস করুন। আপনার ভালো-মন্দের উপর কতটা আমার নজর, তা কি আপনি জানেন না?

"তোমার স্পষ্ট কথার জন্য আমি তোমায় ধন্যবাদ দিচ্ছি, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, আমি তোমার কথায় আর অবিশ্বাস করতে পারছি না। আমি আমার ভুলের প্রতিকার করতে চেষ্টা করবো।"

এই কথার পর সুন বাড়ী ফিরলেন। বাড়ী ফিরে সব কথা তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন।

"তুমি ঠিকই করেছ। কিন্তু আমার যেন মনে হয় তোমার এ প্রভুভক্তির ফল ভালো হ'বে না।"

"কেন?"

"তোমার কথামত মহারাজ কাজ করবেন না। শোন কি ঘটবে। তোমার কথায় রাজকর্মচারীদের ডাক পড়বে। তারাও এমনি ধরা দেবে না। তোমার উপর এসে পড়বে তাদের রোষ। তার ফল যে ভালো হ'বে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।"

"না না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। মহারাজ আমার কথা ভালো ভাবেই নিয়েছেন। আর আজ পর্যন্ত তো তিনি আমার কথা অবহেলা করেন নি!"

"তোমার ইচ্ছে পূর্ণ হ'ক, এই আমার কামনা।"

সুন-ইয়েনের কথায় রাজা ভীষণ অনুতপ্ত হ'য়েছিলেন। এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে তিনি ডেকে পাঠালেন প্রধান মন্ত্রীকে।

মন্ত্রী ছুটতে ছুটতে এলেন। মন্ত্রীর নাম জা-জীও-মি। লোকটা ছিল ভীষণ কঠিন-হৃদয়, সেজন্যে সকলে তাকে ভীষণ ভয় করতো। তাঁর ইচ্ছে ছিল রাজসিংহাসনে বসবে—কিন্তু আজ পর্যন্ত রাজ-সিংহাসন কারুর জন্যে খালি হয় নি।

রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন:

—আমায় জানাবার মত আপনার কিছু নেই?

—কিছুই নেই মহারাজ।

এই কথায় মহারাজ কম্পিত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন:

—কি! তুমি রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী—রাজপথে আমার প্রজারা না খেতে পেয়ে মরে পড়ে থাকছে, আর তা তুমি জানো না? আমার রাজ্যে এমন একটা ঘটনা সম্বন্ধে সংবাদ রাখবার মত লোক তো সে একমাত্র তুমিই—তোমার কর্তব্য এ সংবাদ রাখা।

—মহারাজ, কে আপনাকে এ সব কথা জানালো?

—সুন-ইয়েন।

—ও! একথা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। এই মাত্র

আমি শান্তি-রক্ষকদের কার্য-বৃত্তান্ত পড়ে আসছি—তাতে এ ঘটনার তো কোন উল্লেখ দেখলাম না। সত্যি! এ ভারী আশ্চর্যের কথা।

—যাই হ'ক—আজ বিকেলের উৎসব যেন আর এক মুহূর্ত না চলে।

—আপনার হুকুম অবিলম্বে তামিল করা হ'বে, আর এখনি আমি আমার দপ্তরে গিয়ে, যে কথা আপনি আমায় জানালেন সে সম্বন্ধে সংবাদ নিচ্ছি।

রাজাকে সসম্ভ্রমে প্রণাম করে জা-জীও-মি চলে গেলেন। দু' এক মিনিটের মধ্যে আনন্দ উদ্ভাসিত রাজপ্রাসাদ নিমজ্জিত হ'লো নিবিড় নিস্তব্ধতায়। প্রধান মন্ত্রী তাঁর দপ্তরে ফিরে এসে অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগলেন। সুন-ইয়েনের সংবাদের ফলে তাঁর মন্ত্রিত্বও যেতে পারে, এ ভয় তাঁর খুবই হয়েছিল। সুন-ইয়েনই হ'লো যত নষ্টের মূল—এর প্রতিশোধ নিতেই হ'বে। আজ যা ঘটলো তা আর ঘটতে না দেবার আছে কেবল একটি মাত্র উপায়। সে উপায় হ'চ্ছে সুন-ইয়েনকে ঘাড় থেকে নামানো, এবং তাকে দ্বীপান্তরে পাঠানো। তা হ'লে জা-জীও-মির পথের কাঁটা আর কেউ থাকবে না—পূর্ণ হ'বে তার মনোবাঞ্ছা; অনায়াসেই সে বসতে পারবে রাজসিংহাসনে।

কিন্তু সুনকে দ্বীপান্তরে পাঠাতে গেলে ফন্দি তো একটা আঁটতে হ'বে—একটা কোন ছুতো তো চাই। জা-জীও-মি অনতি-বিলম্বেই একটা মতলব ঠিক করে ফেললে।

রাজার বিরুদ্ধে কুকথায় ভরা একখানা চিঠি তিনি লিখে ফেললেন শান-হুনিকে। তিনি নিজে সুন-ইয়েনের স্বাক্ষর করলেন সেই চিঠিতে। তারপর তিনি ঠিক করলেন সেই চিঠি রাজার কাছে পৌঁছে

দেবেন এবং মহারাজকে বলবেন, একজন প্রহরী এ চিঠি রাজপথের উপর কুড়িয়ে পেয়েছে।

যেমন ভাবা, তেমনি কার্যে পরিণত করা। চিঠি লেখা হ'লো। ছদ্মবেশে জা-জীও-মি বা'র হ'লেন, পথ চলতে চলতে চিঠিখানি ফেলে দিলেন এক প্রহরীর পায়ের কাছে এবং তাড়াতাড়ি দূরে সরে গেলেন। প্রহরী হেঁট হ'য়ে চিঠিখানি তুলে নিয়ে আর কাউকে দেখতে পেল না। কুড়িয়ে-পাওয়া পত্র নিয়ে সে চললো তার কর্তার কাছে।

শান্তিরক্ষা দপ্তরের কর্তা চিঠিখানি খুলে পড়লেন। চিঠি পড়ে তিনি খুব আশ্চর্য হ'য়ে গেলেন। নিজে কেমন তৎপর তাই প্রমাণ করবার জন্যে তিনি তক্ষুণি গেলেন রাজপ্রাসাদে এবং অবিলম্বে সম্রাটের সাক্ষাৎ চাইলেন।

সম্রাট অনতিবিলম্বে তাকে ডেকে পাঠালেন। শান্তিরক্ষা দপ্তরের কর্তা মহারাজকে সব কথা জানালেন। রাজা যে কি ভীষণ আশ্চর্য হ'লেন তা সকলেই বুঝতে পারলে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রধান মন্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন।

জা-জীও-মি ছুটে এলেন। মহারাজ তাঁর সামনে ধরলেন সেই চিঠি এবং জিজ্ঞেস করলেন, সেখানা সত্যিই সুন-ইয়েনের লেখা চিঠি কিনা।

প্রধান মন্ত্রী চিঠিখানি পড়বার ভান করলেন। তিনি বেশ বুঝতে পারলেন রাজার মনের অবস্থা এবং ঠিক করলেন এ সুযোগ ছাড়লে সুন-ইয়েনকে আর জব্দ করা যাবে না।

"মহারাজ, অনেক সময় যা'দের খুব বেশি বিশ্বাস করা যায়, তারাই করে বিশ্বাসঘাতকতা। যদি সুনের কথাই ধরেন, তাহ'লে সে যে এ কাজ করতে না পারে তা আমি বিশ্বাস করতে রাজী নই। আমি অনেকদিন থেকেই শুনছি, সে মতলব করছে কেমন করে

আপনার সিংহাসনে বসে। আর, যে-সব ঘটনার কথা সে আপনার কাছে বলেছে, তা সবই তার নিজের কীর্তি।"

"যথেষ্ট হ'য়েছে! তুমি যাও সুন-ইয়েনকে বন্দী কর—পরে তার বিচার হ'বে।"

জা-জীও-মির মনে আনন্দ আর ধরে না। তিনি কালবিলম্ব না করে সুন-ইয়েনকে বন্দী করলেন।

রাজা যখন এ সংবাদ পেলেন তখন তিনি স্বয়ং গেলেন বন্দীর কাছে। তিনি চিঠিখানি সুন-ইয়েনকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—

"চিনতে পারছ এ চিঠি?"

সুন কী ভীষণ ভাবে যে আশ্চর্যান্বিত হ'লো তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তিনি বুঝতে পারলেন ফাঁদে পড়েছেন—কিন্তু ব্যাপারটা এত বেশি তার আশ্চর্যজনক বলে মনে হ'চ্ছিল যে তাঁর মুখে কথা ফুটলোনা।

রাজা বললেন—"এমন কাজ আমি তোমার কাছ থেকে আশা করি নি।"

হতভাগ্য সুন উত্তর দিলেন—"আমি তো কিছু বুঝতে পারছিনা মহারাজ!"

এই কথায় মহারাজ একেবারে ক্ষেপে গেলেন। তিনি বললেন—"ওঃ, তুমি কিছু বুঝতে পারছ না, নয়? কিন্তু তুমি আমায় বলবে কি, কে এই চিঠি লিখেছে?

"যেই লিখুক—আমি লিখিনি।"

"মিথ্যে কথা। শোন, ধোঁয়া কি তা জানো?"

"জানি মহারাজ।"

"উনুনে কাঠ দিয়ে আগুন না দিলে ধোঁয়া ওঠেনা—কিন্তু আগুন দিলে ধোঁয়া উঠবেই। আমার বক্তব্য হ'চ্ছে, যদি আমাকে

কোন বিপদে ফেলবার ইচ্ছে তোমার না থাকতো, তাহ'লে তোমার বন্ধুকে তুমি কখনও এমন পত্র লিখতে না।”

“মহারাজ, আমি বুঝতে পারছি কোথা থেকে আমার এ বিপদ আসছে। যে সংবাদ আমি আপনাকে দিয়েছি, সেই সংবাদই আমার শত্রুরা সৃষ্টি করেছে—তারা চায় আমার পতন।”

“নিজেকে বাঁচাবার জন্যে তোমার আর কিছু বলবার নেই? বেশ।”

মহারাজ স্থন-ইয়েনকে নিরাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত করে চলে গেলেন। প্রধান মন্ত্রীর উপর হুকুম হ'লো স্থনকে দ্বীপান্তরে পাঠাবার এবং ঠিক হ'লো তাকে কাং-শিং দেশে পাঠাতে হ'বে।

শান-হুনিকেও এ ব্যাপারে জড়িয়ে কো-কুম-টো দেশে দ্বীপান্তরিত করবার হুকুম হ'লো।

রক্ষীর সঙ্গে স্থন বাড়ী ফিরে সব কথা তাঁর স্ত্রীকে জানালেন। হতভাগী রমণীর দুঃখের আর সীমা রইলো না। তিনি বললেন, “কি তোমায় আমি বলেছিলাম সেদিন?” কিন্তু তিনি শীঘ্রই নিজেকে সামলে নিয়ে তাঁর উপর যে-বিপদ ভেঙ্গে পড়লো, সে সম্বন্ধে স্থিরভাবে চিন্তা করে নিলেন। তিনি স্বামীকে বললেন—

“চিন্তা করে কি হ'বে প্রিয়তম। আমাদের রাজাকে ছেড়ে দূরে থাকতে কষ্ট হ'বে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু অন্ততঃ ভবিষ্যতে আমরা শান্তিতে বাস করতে পারব তো…”

দ্বীপান্তরে পাঠাবার যোগাড়-যন্ত্র হ'তে থাকলো। যা কিছু ধন-রত্ন ছিল, সবই সে বিলিয়ে দিলে গরীব দুঃখীদের।

যাবার দিন এগিয়ে এলো। স্থন-ইয়েন ও তাঁর স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের আলিঙ্গন থেকে নিজেদের মুক্ত করে নিয়ে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

## দুই

সুন-ইয়েন ও তার স্ত্রীকে শীঘ্রই কাং-শিং দেশে দ্বীপান্তরে পাঠানো হ'লো। তাদের দুজনকে সেই নির্জন দ্বীপে নিঃসঙ্গ ভাবে নামিয়ে দিয়ে প্রহরীরা সকলে ফিরে এলো।

সুনের এই ভেবে দুঃখ হ'লো যে দুঃখে কষ্টে তার স্ত্রী এই দ্বীপের উপর মারা পড়বে। মনের কথা তিনি স্ত্রীকে বললেন। তাঁর স্ত্রী উত্তর দিলেন ঃ

"তুমি ভেবোনা। চিরকাল আমি তোমার সঙ্গে থাকবো এই আমার লক্ষ্য। তোমার সঙ্গে থাকলে দিন কাটতে আমার একটুও দেরী হ'বে না।"

সত্যি সত্যিই সেই জনমানবশূন্য দেশে তাদের দু'জন নির্বাসিতের দিন কাটতে লাগলো—বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যেমন দ্রুত দিন কাটে, তেমনি দ্রুতই তাদের দিন কাটতে লাগলো। শীঘ্রই বসন্ত তার আগমনের সাড়া দিলে। সুন একদিন তার স্ত্রীকে বললে ঃ

"বসন্ত এসেছে—কি সুন্দর আজকের দিন। চলনা চারদিকটা একবার ঘুরে দেখে আসা যাক।"

—চল।

—চল পাহাড়ের উপরে যাই।

তারা চললো—তাদের দেখলে কে বলবে তারা দুঃখী। নিজেদের তারা হারিয়ে ফেললে চারদিকের চমৎকার দৃশ্যের মধ্যে। এগিয়ে চললো তারা। আত্মা তাদের ভরে উঠল বিপুল আনন্দে। সুনের স্ত্রীর যেন আনন্দের আর সীমা নেই। সে তার স্বামীকে বললে, "কেমন শান্ত চারদিক। এমন করে তোমার সঙ্গে একলা বেড়াতে আমার

যে কী আনন্দ হ'চ্ছে, তা তোমায় কি বলবো। যখন রাজধানীতে থাকতাম তখন তো আর তোমার সঙ্গে বেড়াতে পেতাম না—"

সত্যি কথাই বলেছ তুমি, সেখানে দেশাচার মেনে তো আমায় চলতে হতো।"

—এই দেখ আমরা পাহাড়ের পদপ্রান্তে এসে পড়েছি। চোখের সামনে কী সুন্দর দৃশ্য-পট! এস, এক মুহূর্ত মনে মনে উপভোগ করি। এই সুন্দর ছবি! মনের ভিতর যেন কবিতার প্রেরণা পাচ্ছি। শোন—

সুন্দর সময়—<br>
পাতায় পাতায় ঢাকা ফুলদল<br>
মৌমাছি কি যে খোঁজে করে কত ছল<br>
হেরে মনে হয়—<br>
গাছে গাছে পাতা গুনে ফিরিছে কেবল।<br>
তরু শাখে শাখে—<br>
যত আশীবিষ, আলসে ঘুমায়<br>
উত্তাপে আহত তারা, ব্যথা সারা গায়।<br>
গুল্মের ফাঁকে—<br>
ব্যাং সুখে উপভাগ করিছে হাওয়ায়।<br>
উড়িছে পাখীর দল—<br>
ধরিয়া পতঙ্গ দল মিটায় ক্ষুধায়।

—সত্যি এই কীট-পতঙ্গ জন্তুগুলো আমাদের চেয়ে কত সুখী!

—কেন তুমি একথা বলছো ?—সুন জিজ্ঞেস করলে।

—পাখিদেরও বংশধর আছে, আমাদের ছেলে-মেয়ে কেউ নেই।

—দুঃখ করো না প্রিয়া। সন্তান হ'বার বয়স তো আমাদের

এখনও বয়ে যায়নি। ভবিষ্যতে বিশ্বাস রাখো—আমাদের একটি মিলনকে তো ভগবান আশীর্বাদ করতেও পারেন। চল, ফেরবার সময় হয়েছে। সূর্যি পশ্চিমে হেলে পড়েছে—তুমিও নিশ্চয় পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়েছ।

স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই ধীরে ধীরে স্বপ্ন-বিভোর হ'য়ে বাড়ী ফিরলেন।

কয়েকদিন পর সুনের স্ত্রী স্বপ্ন দেখলেন, আকাশ থেকে খসে পড়লো একটি চাঁদ তাঁর দেহের উপর। অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে চমকে জেগে উঠলেন তিনি এবং সঙ্গে সঙ্গে সে কথা তিনি বললেন তাঁর স্বামীকে।

—সত্যিই তো! অদ্ভুত স্বপ্ন!! কিন্তু ভয় পেয়ো না। পরিশ্রান্ত হয়েছিলে বলে হয়তো স্বপ্ন দেখেছ।

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, সুনের স্ত্রী সন্তান-সম্ভবা হ'লেন।

শীঘ্রই একটি মেয়ে জন্মালো তাঁদের। মেয়ের নাম রাখলেন তাঁরা চেং-ই। সুনের আনন্দের আর সীমা নেই, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে তাঁর স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর বাঁচবার আশা পর্যন্ত রইলো না। চেং-ইর জন্মের তিন দিন পর তাঁর মা মারা গেলেন। সুন-ইয়েনের স্ত্রী বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর সময় এগিয়ে এসেছে, সেইজন্যে মারা যাবার কিছু পূর্বে স্বামীকে দেখে বললেন—

"প্রিয়তম, আমি তোমায় ছেড়ে চললাম। জানি আমি তোমার দুঃখের আর শেষ থাকবে না, কিন্তু দেখো সে দুঃখে তুমি যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলো না। সবার আগে আমাদের মেয়ে, তুমি তার জন্যে একজন ধাই-মা যোগাড় করো।"

অনেক কষ্টে মরণোন্মুখ রমণী ক্ষুদ্র শিশুকে বুকে টেনে নিয়ে তাকে স্তন্য পান করাতে করাতে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "হায়, এই প্রথম আর এই শেষ, এমনি করে তোকে আমি আমার কাছে পেলাম।"

স্থন মর্মন্তুদ বেদনা জর্জরিত হয়ে বললেন ঃ

—প্রিয় পত্নী, সত্যিই কি তুমি আমায় ছেড়ে চলে যেতে চাও? চিরকালটা আমি দুর্ভাগাদের রক্ষা করে এসেছি, আর আজ ভগবান আমাদের এমন দুর্দশা করলেন। সত্যি! এ তাঁর ভীষণ অবিচার।

শেষ কথাগুলো রমণীর কাণে প্রবেশ করলো না। মৃত্যু এরই মধ্যে তাঁকে স্পর্শ করেছে, স্থন তা বেশ বুঝতে পারলেন, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারলেন না। অশ্রু-ভেজা কণ্ঠে তিনি প্রিয়তমাকে ডাকতে লাগলেন, কিন্তু হায় রে! কোন উত্তরই আর তিনি পেলেন না। তিনি চিৎকার করে উঠলেন।

—"আমি একা!" কী গভীর তার হতাশা! "আমার কি হবে—কি করবো আমি এই ক্ষুদ্র শিশুকে নিয়ে।"

মেয়েটির পানে স্থনের দৃষ্টি পড়লো। তখনও মাতৃস্তন্যে মুখ দিয়ে শিশু মায়ের বুকে পড়ে। দ্বিগুণ বেদনায় ভরে উঠলো স্থনের হৃদয়। তিনি শিশুকে মায়ের বুকের উপর থেকে তুলে নিয়ে একটি স্ত্রীলোকের হাতে স'পে দিলেন। তারপর আধ-পাগলার মত তিনি তার স্ত্রীর শেষকৃত্য সমাপ্ত করলেন।

এই সব কাজ এত শীঘ্র শেষ হ'য়ে গেল যে স্থনের মনে হ'চ্ছিল তিনি যেন স্বপ্ন দেখছিলেন। নিজেকে তার পর তিনি বেদনার হাতে সমর্পণ করলেন। প্রতিদিন তিনি যান স্ত্রীর কবরের কাছে, এমনি করে জিইয়ে রাখলেন তিনি তাঁর বেদনাকে।

' বেদনায় স্থন দিন-রাত কাঁদে। শীঘ্রই বুঝতে পারলে তাঁর দুটি চোখ অন্ধ হ'য়ে গেছে। বিপদের উপর বিপদ।

এ ভীষণ আঘাতেও তিনি ভেঙ্গে পড়লেন না—তিনি জীবন কাটাতে লাগলেন। তাঁর সবচেয়ে বড় দুঃখ হ'চ্ছে যে তিনি আর তাঁর মেয়েটির মুখ দেখতে পান না। চেং-ই বড় হ'তে থাকে। তার তের

বছর বয়স হ'লো, এবং সে-ই বাধ্য হ'লো তার হতভাগা বাপকে দেখা-শুনা করতে। সে ভিক্ষে করে যা কিছু নিয়ে আসে, তাই দিয়ে বাবাকে কোন রকমে বাঁচিয়ে রাখলে মৃত্যুর হাত থেকে। বৃথা লজ্জায় অভিভূত না হ'য়ে সে তার কর্তব্য করে যায়। একদিন সে তার পিতাকে বললে, "বাবা, একটা কথা আমার মনে হয়, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারি না।"

—কি বল মা ?

—দেখ বাবা, অন্য সকলে তাদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বাস করে, আমরা কেন এমন একা ?

—হায় রে! তুই সত্যি কথাই বলেছিস্। কিন্তু চিরকালই আমাদের এ অবস্থা ছিল না। এমন সময় ছিল যখন আমি তোর মার সঙ্গে রাজধানীতে বাস করতম ; আর আত্মীয়-স্বজনরা আমাদের ঘিরে থাকতো। আমারও ছিল খুব উঁচুপদ। আমি হ'চ্ছি খুব বড় বংশের সন্তান এবং রাজার সঙ্গেও আমাদের সম্বন্ধ খুব ভালো ছিল। কিন্তু একদিন চক্রীর চক্রান্তে আমাদের দোষী সাব্যস্ত করে রাজা আমাদের দ্বীপান্তরে পাঠালেন—সেদিন থেকে আমরা এই দ্বীপেই রয়েছি। আমার বন্ধু শান-হুনিও সেই ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে দ্বীপান্তরিত হলেন কো-কুম-টো দ্বীপে। তিনিও ছিলেন বড় বংশের ছেলে—তিনি আমার বিপদের ভাগ নিলেন। এতদিন এই দ্বীপে রয়েছি, তাঁর খোঁজ কিছুই পাইনি।

—তার কারণ বাবা, হয়তো তাঁর খবর দেবার মত কোন লোক নেই। মেয়েটি সান্ত্বনা দেবার জন্যে এই কথা বললে।

—বাবা আমার দেরী হ'য়ে যাচ্ছে, এবার আমি যাই।

—যাও মা, কিন্তু সকাল সকাল ফিরো।

চেং-ই ত্বরিত পদে চলে গেল। সে প্রথম গেল তার মায়ের

গোরের কাছে প্রার্থনা করবার জন্যে। চেং-ই যেমন কাজের মেয়ে, তেমনি বুদ্ধিমতী। রাতের বেলা সে পড়াশুনা করে, আর দিনের বেলা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়ায়। প্রায়ই সে রাতের বেলা তার মায়ের কথা চিন্তা করে, কিন্তু মাকে দেখবার সুযোগ আর তার হয়নি।

একদিন সে তার অভ্যাস মত মায়ের কবরের পাশে বসে বসে কাঁদছে—ফিরতে তার দেরী হ'য়ে গেছে—নিয়মিত সময়ে বাড়ী ফেরেনি।

সময়ে ফিরতে না দেখে সুন মেয়ের জন্যে চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ঠিক করলেন চেং-ইর খোঁজে বার হ'বেন। লাঠির উপর ভর দিয়ে তিনি এসে পৌছালেন রাস্তার উপর। কাছেই ছিল একটি হ্রদ। পা পিছলে পড়লেন তিনি হ্রদের জলে।

সুন চিৎকার করে উঠলেন!

—এইবার আমার মৃত্যু সুনিশ্চিত, আমার মেয়ে আমাকে চারি-দিকে খুঁজে বেড়াবে!

সুখের বিষয় হতভাগ্যের করুণ চিৎকার শুনতে পেল পাহাড়ের উপরের এক দেব-সেবায়েত। সে ছুটে এসে সুনকে জল থেকে তুলল। সে সুনকে জিজ্ঞেস করলে—

—কোথায় থাক?

—কাছেই।

—তুমি অন্ধ, একলা বেরিয়েছ কেন? এমনি করে কি নিজেকে বিপদে ফেলে?

—জানতাম বিপদে পড়বো। আর আমি একলা কখনও ঘরের বা'র হই না। আমার মেয়ের কাছে যাবার জন্যে আজ বা'র হয়ে-ছিলাম। মেয়েটি রোজ যে সময় ঘরে ফেরে সে সময় ঘরে না

ফেরায় ভয় হ'লো, তাই বা'র হ'লাম। এখন বুঝতে পারছো তো কেন বা'র হয়েছিলাম। যদি তুমি না থাকতে, তা হ'লে আজ আমি হ্রদের জলের তলায় তলিয়ে যেতাম। তুমি আজ আমার জীবন রক্ষা করেছ।

লোকটি সুনকে হাতে ধরে ঘরে পৌঁছে দিলে। পথে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলে ঃ

"আমি তোমায় একটা কথা বলবো, কিন্তু তা কি তুমি বিশ্বাস করবে ?"

—নিশ্চয়ই।

—বেশ! আমি বলছি তোমার দুর্ভাগ্য বেশি দিন থাকবে না। সে কথা তোমার কপালেই লেখা রয়েছে। আজ থেকে তিন বছরের মধ্যে তুমি তোমার দৃষ্টি ফিরে পাবে এবং তুমি প্রধান মন্ত্রীর পদ পাবে। তোমার মত সুখী আর কেউ থাকবে না। কিন্তু তোমার সুদিন ফিরে পেতে গেলে ভগবান চেন-হুয়াং-এর পূজা করতে হ'বে।

আনন্দে উন্মত্ত হ'য়ে সুন বললে—"আমি যে আমার কানকে বিশ্বাস করতে পারছি না।"

সেবায়েত গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলে ঃ

—এর চেয়ে সত্যি আর কিছু হ'তে পারে না।

—কি আমায় করতে হ'বে বলে দাও।

—আমায় ৩০০ বস্তা চাল দিতে হ'বে। আমি তোমার হ'য়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবো।

—হায়! তুমি যা চাইছ তাতো আমার দেবার সামর্থ্য নেই।

—তাতে কি এসে যায়? আমি এখনি ৩০০ বস্তা চাল চাইছি না। যখন তোমার সুদিন হ'বে তখন তুমি আমায় ৩০০ বস্তা চাল দেবে—এই শর্তে একটা চুক্তি করতে হ'বে আমার সঙ্গে।

—আমি রাজী।

সেবায়েত তার সামনে একখানা খাতা ধরলে। সুন খাতায় তাঁর স্বাক্ষর দিলেন।

—এখন তা হ'লে আমি যাই—বললে সেবায়েত।

—আচ্ছা, তাহলে শীঘ্র আবার আমাদের দেখা হ'বে।

একলা বসে বসে সুন সেবায়েতের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। আবার সে দিনের আলো দেখতে পাবে, আবার সে তাঁর মান-সম্ভ্রম ফিরে পাবে, এই কথা চিন্তা করে সুনের মন আনন্দে ভরে-উঠলো। কিন্তু ৩০০ বস্তা চালের কথা ভেবে তাঁর মন অনেকটা দমে গেল। যা'র মেয়ে লোকের দ্বারে দ্বারে দুটি অন্নের জন্যে ভিক্ষে করে বেড়ায়, তিনি কি করে এমন চুক্তি মেটাবেন? যে প্রতিজ্ঞা তিনি রাখতে পারবেন না, সে প্রতিজ্ঞা তিনি কেন করলেন—এই ভেবে তিনি অনুতপ্ত হ'লেন।

তাঁর মেয়ে এসে পড়ায় চমক ভাঙলো।

"কি তুমি এত ভাবছ বাবা?"—মেয়ে জিজ্ঞেস করলে। "আমি দেরী করে বাড়ী ফিরেছি বলে কি তুমি কষ্ট পেয়েছ? আমায় ক্ষমা কর বাবা। মায়ের কবরে গিয়েছিলাম, সেখান থেকে আমি ভিক্ষা করতে গিয়েছিলাম। এই দেখ বাবা, কত কি সকলে দিয়েছে। এখন তুমি আমায় ক্ষমা করছো তো?"

—তোর জন্যে আমি ভাবছি না মা। শোন মা কি হ'য়েছিল।

—তুই ঘরে ফিরতে দেরী করছিস্ বলে আমি তোর খোঁজে বা'র হ'লাম। পথে যেতে যেতে হ্রদের জলে পড়ে গিয়ে ভাবলাম, এবার আমার জীবনের শেষ হ'লো। ভাগ্যক্রমে একজন সেবায়েত আমায় রক্ষা করলে। পথে আসতে আসতে লোকটি আমায় বললে, 'তুমি

তোমার দৃষ্টি ফিরে পাবে—তুমি আবার রাজার প্রধান মন্ত্রী হবে।' কিন্তু আমায় ৩০০ বস্তা চাল দিতে হবে, তা' তো কখনও আমার সাধ্যে কুলোবে না। সেই জন্যেই বিমর্ষ হ'য়ে পড়েছি।'

—তুমি বেশি চিন্তা কোরো না বাবা। তোমার প্রতিজ্ঞা তুমি যা'তে রাখতে পারো তার একটা উপায় আমি করবো।

খাওয়া-দাওয়ার পর মেয়েটি নিজের ঘরে গেল। সে তার বাবার কথাগুলো ভাবতে লাগলো। ঘুমোতে না পেরে সে গেল নদীতে স্নান করতে। তারপর বাগানে পূজার বেদীটি পরিষ্কার করে তার উপর জল-ভরা একটি কলসী বসিয়ে দিয়ে, দীপ আর ধুপধুনা জ্বেলে দিলে; তারপর সে ভগবানের আরাধনা করতে লাগলো। ক্রমশ উষার আলো দেখা দিল।

তখন চেং-ই ঘরে ফিরলো। পরিশ্রান্ত হ'য়ে সে ভেঙ্গে পড়লো ঘুমের বুকে। সে স্বপন দেখলো : এক বৃদ্ধ তাকে বলছে, "এখনি তোমার দ্বারে একজন লোক আসবে। এই লোকটি তোমায় কিছু করতে বলবে। তুমি ইতস্ততঃ না করে এ সুযোগ গ্রহণ করবে।"

মেয়েটির ঘুম ভেঙ্গে গেল, মনে রইলো তার স্বপ্নের কথা। স্বপ্ন শীঘ্রই সত্যে পরিণত হ'লো।

যে সময়ের কথা আমরা বলছি, সে সময়ে কতকগুলি কোরীয় ব্যবসাদার পীতসমুদ্র পার হ'য়ে যেতো বাণিজ্য করতে। জায়গায় জায়গায় সমুদ্রের স্রোত খুব বেশি থাকায়, তাদের সময়ে সময়ে ভীষণ বিপদে পড়তে হ'তো। প্রত্যেকবারই তাদের দু' একখানা জাহাজ ডুবে যেতো। এই বিপদ থেকে রক্ষা পা'বার জন্যে একটা পুরাতন প্রথা অনুযায়ী তা'রা একটি ছোট মেয়েকে যোগাড় করে তাকে সমুদ্রের বুকে ভাসিয়ে দিত। তাদের ধারণা ছিল, এইভাবে তারা বিপদ থেকে উদ্ধার হ'তে পারবে। যখন বণিকেরা এমনি

একটি মেয়ের অনুসন্ধান করছে, ঠিক সেই সময়ে চেং-ই ঘর থেকে বার হ'য়ে দেখতে পেলে একজন বণিককে।

বণিক চেং-ই-কে জিজ্ঞেস করলে এরকম একটি মেয়ে কোথাও পাওয়া যা'বে কি না।

এ প্রশ্নে চেং-ই উত্তর দিলে ঃ

—তোমায় বেশি দূর যেতে হ'বে না। যদি আমায় নিলে হয়, তা হ'লে আমি তোমার কথামত কাজ করতে পারি। কিন্তু পরিবর্তে কি দেবে আমায় ?

—যা তুমি চাও।

—যদি আমি ৩০০ বস্তা চাল চাই ?

—আমি রাজী আছি। তবে একবার আমার বন্ধুদের সঙ্গে কথা কইতে হ'বে। ছ' চার দিনের মধ্যে তোমায় আমাদের মতামত জানাবো।

—আমি অপেক্ষা করবো।

—তাহালে আসি। এই বলে বণিক চলে গেল।

এত সহজে এত বড় একটা ব্যাপার মিটিয়ে ফেলতে পারায় মেয়েটির আনন্দ হ'লো। সে অস্থিরভাবে বণিকের আশাপথ চেয়ে দিন গুণতে লাগলো। যথাকালে একদিন সকালে সে দেখলে বণিক তাদেরই বাড়ীর দিকে আসছে। চেং-ই তাড়াতাড়ি ছুটে গেল তার সঙ্গে দেখা করতে।

—সকলে রাজী হ'য়েছে ?—চেং-ই জিজ্ঞেস করলে।

—হ্যাঁ, তোমায় ৩০০ বস্তা চাল দেওয়া হ'বে। এক্ষুণি কি তুমি চাও ?

—হ্যাঁ। তাহ'লে আমি ভারী সুখী হ'বো। কিন্তু তুমি একটু অপেক্ষা কর। একবার বাবাকে বলে আসি।

চেং-ই বাড়ীতে প্রবেশ করলো। তার মনের কথা সে বাবাকে

কেমন করে জানাবে, কিছু ঠিক করতে পারলে না। সে মনে মনে বললে, বাবাকে একথা বলা মানেই তাঁর মৃত্যুকে ডেকে আনা। যে দিন আমার বাড়ী ফিরতে দেরী হ'য়েছিল, সেদিন যে তিনি কতদূর উদ্বিগ্ন হ'য়েছিলেন তা আমার মনে আছে।

যদি তিনি শোনেন আমি আর ফিরব না......ঐযে বাবা আসছেন! চেং-ই তার পিতার গলা জড়িয়ে ধরে আনন্দের স্বরে বললে :

—বাবা, তুমি সেবায়েতকে যে ৩০০ বস্তা চাল দেবে বলেছিলে—তা'র আমি একটা উপায় করেছি। এখন তোমার পাওনাদার এলেই হ'লো।

পাওনাদার এসে হাজির হ'লো। চেং-ই তাকে সঙ্গে করে নিয়ে বণিকের কাছে গেল এবং বণিককে বললে সেবায়েতকে ৩০০ বস্তা চাল দিতে। সেবায়েতের কাছ থেকে পিতার স্বাক্ষরিত কাগজ ফিরিয়ে নিয়ে চেং-ই বললে, "এইবার তুমি আমার অন্ধ বাবার জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর।" সেবায়েত ঘাড় নেড়ে জানালে সে প্রার্থনা করবে এবং এই কথা জানিয়ে সেবায়েত চলে গেল।

এমনি করে নিজেকে বলিদান দিয়ে, আনন্দে নৃত্য করতে করতে চেং-ই গেল তার বাবার খোঁজে; বাবাকে সে চুক্তিপত্রখানি ফেরত দিলে।

—কোত্থেকে পেলি মা এ কাগজখানা ?

—সেবায়েতের কাছ থেকে। তোমার প্রতিজ্ঞা মত তাকে আমি ৩০০ বস্তা চাল দিয়েছি।

—কোথা থেকে পেলি তুই ৩০০ বস্তা চাল ?

—খুব সোজা উপায়ে বাবা। আমি আমাকে বিক্রি করেছি।

—কি বল্লি! তোর কি ইচ্ছে আমি মরি ?

—দুঃখ কোরোনা বাবা। আর আমি যা প্রতিজ্ঞা করেছি তা আমায় রাখতে দাও। সত্যিই বাবা, আমি নিজেকে বিক্রি করেছি। কিন্তু বেশি দূর যাব না আমি। এখান থেকে রোজই আমি তোমায় দেখতে আসতে পারবো, তাহ'লে তো তুমি আর একলা থাকবে না। তোমার সুখের জন্যে আমি আমার স্বাধীনতা বলি দিয়েছি, তাতে আমার যে কি আনন্দ তা আর তোমায় কেমন করে জানাবো। যখন আমাদের অনেক টাকা হ'বে, তখন চালের মূল্য দিয়ে দিলেই আবার আমার স্বাধীনতা ফিরে পাব, তাহ'লেই চিরকালের জন্যে তোমার কাছে থাকতে পারবো, বাবা।

বাবাকে এমনি করে শান্ত করে ছুটলো সে বণিকের কাছে, জিজ্ঞেস করতে কবে তাকে যেতে হ'বে।

বণিক বল্‌লে তিন মাসের আগে তারা যাত্রা করবে না। এই তিন মাস চেং-ই কেবল চিন্তা করতে লাগলো—সে চলে গেলে তার বাবার কি অবস্থা হ'বে। অসহায়, সম্বলহীন অন্ধের কি হ'বে! এই চিন্তা ভূতের মত চেং-ইকে রাত-দিন পেয়ে বসলো। বাপের প্রতি মেয়ের ভালোবাসা! চেং-ই প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলো বাবার জন্যে কিছু পয়সা-কড়ি আর কিছু খাবার জিনিস যোগাড় করে রেখে যাবার জন্যে, যাতে তার বাবা তবু কিছুদিন খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে।

দেখতে দেখতে তিন মাস কেটে গেল। বণিক এলো মেয়েটিকে তার চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে। মেয়েটি বললে আর একবার সে তার বাবার সঙ্গে কথা কইবে। এখনও বাবাকে সত্যি কথা জানায় নি। বণিক মত দিয়ে চেং-ই'র সঙ্গে গেল।

—বাবা এইবার তোমায় ছেড়ে যেতে হ'বে।

—আমায় ছেড়ে যাবি! কোথা যাবি মা?

—বাবা সেদিন আমি তোমায় মিছে কথা বলেছিলাম। আমার স্বাধীনতা নয় বাবা, আমি আমার জীবন বিক্রি করেছি তোমার চুক্তির ৩০০ বস্তা চালের পরিবর্তে। হ্যাঁ বাবা, আমি আমার দেহ মন সব বিক্রি করেছি—আমাকে পীত সাগরের তলায় যেতে হ'বে, ভগবানকে প্রার্থনা করতে হ'বে বণিকদের জাহাজ রক্ষা করবার জন্যে।

মনের কথা বলবার জন্যে চেং-ই তার বাবাকে আল্‌গা ভাবে জড়িয়ে ধরেছিল। কিন্তু সে আঘাত অন্ধ সহ্য করতে পারলো না, সে জ্ঞান হারিয়ে পড়লো মাটির উপর।

যখন তার জ্ঞান হ'লো, তখন সে ক্ষীণ স্বরে বলতে লাগলো: "হতভাগী! সত্যিই কি তুই আমায় ছেড়ে যাবি? তোর মা'কে চোখের সামনে মরতে দেখেছি, তোকেও কি এবার আমার আগে এ ধরণী ছেড়ে যেতে দেখতে হ'বে? বল মা, এ তোর মিথ্যে কথা—বল মা এ স্বপ্ন। চেয়ে দেখ তোর অন্ধ বাপের দিকে, একবার ভেবে দেখ, তুই চলে গেলে আমার অবস্থা কি হ'বে! না-না, তুই সত্যি কথা বলছিস না, নয়?"

সুন-ইয়েন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। চেং-ই বৃথাই চেষ্টা করলো নিজের চোখের জল ধরে রাখতে, সেও ডুকরে কেঁদে উঠলো। বণিক এ দৃশ্য দেখে আর স্থির থাকতে পারছিল না। সে মেয়েটিকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে বললে—

—তোমায় আমরা আরো ১০০ বস্তা চাল দেব, আর আজ থেকে তিন দিন পর আমরা বার হ'বো।

চেং-ই তাকে সর্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিয়ে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলে। তারপর যখন সে একশ' বস্তা চাল পেল, তখন সে গেল দেশের রাজার কাছে। রাজা তার বাবাকে দেখাশুনা করতে রাজী হ'লেন।

যতক্ষণ না বণিক তার খোঁজে এলো, ততক্ষণ সে তার বাপের

কাছ-ছাড়া হ'লো না—কেবল চেষ্টা করতে করতে লাগলো বাবাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে। বিদায়ের ঘণ্টা যখন বাজলো তখন সে কী হৃদয়-বিদারক দৃশ্য!

সুন-ইয়েন তার কন্যাকে পাগলের মত বুকে জড়িয়ে ধরে বললে, "আমিও তোর সঙ্গে মরবো—তোকে কিছুতে আমি একলা যেতে দেব না।" অন্ধের আকুল ক্রন্দন শুনে, পাড়াপড়শীরা সব ছুটে এলো—এই নিদারুণ দৃশ্য দেখে সকলেরই চোখে জল ভরে উঠলো। শেষে বণিক মেয়েটির হাত ধরে বললে ঃ

—চল এবার।

বেদনায় আত্মহারা হ'য়ে অন্ধ অজ্ঞান হ'য়ে পড়লো, কন্যা মুক্ত হ'লো।

—বিদায় দাও বাবা। তুমি শান্ত হও। আমাদের আবার দেখা হ'বে আর এক পৃথিবীতে, সেখানে আমাদের সুখের জন্য কিছুরই অভাব হ'বে না।

চেং-ই চললো। রাজাও সেখানে এসেছিলেন। তিনি কিছুক্ষণ অন্ধের কাছে রইলেন, এবং চেষ্টা করলেন বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে ; কিন্তু তা সম্ভব হ'লো না।

## তিন

এদিকে স্থন-ইয়েনের প্রাণের বন্ধু শান-হুনিকে বন্ধুত্বের দায়ে দ্বীপান্তরিত হ'তে হ'য়েছিল। তাকেও কোরীয়ার রাজধানী ছাড়তে হ'লো, কিন্তু কি করে ছেড়ে যাবে তার সন্তান-সম্ভবা সাধ্বী স্ত্রীকে। স্ত্রীকে ছেড়ে যা'বার তার একটুও ইচ্ছে ছিলনা, কিন্তু উপায় নেই; তাকে যেতে হ'লো দ্বীপান্তরে—কো-কুম-টো দেশে।

অনেক দিন লাগবে সমুদ্রের উপর দিয়ে কো-কুম-টো দেশে যেতে। কতকগুলি লোক কিছু কিছু পুরস্কারের আশায় শান-হুনিকে সেই দেশে পৌঁছে দেবার ভার নিলে। যাদের জাহাজে শান-হুনি যা'বে তারা ছিল তুই ভাই। একজনের নাম শু-রুং আর একজনের নাম শু-ইয়েং। তুজনের চরিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত।

যতদিন জাহাজ তীরের কাছ দিয়ে যেতে লাগলো, ততদিন কোন গোলমাল হ'লো না। কিন্তু জাহাজ যখন সমুদ্রের মাঝখানে এসে পৌছালো, তখন শু-রুং নিজ মূর্তি ধরলে।

সে তার ভাইকে বললে, "দেখ তোমার যাত্রীর বৌটিকে আমার ভারী ভালো লাগে। আমি ওকে চাই। স্বামীটাকে নিয়েই যত বিপদ, তাকে মেরে ফেললেই চুকে যাবে।

—'তুই কি পাগল হ'য়েছিস', বল্‌লে তার ভাই, 'আমি তোকে এমনি করে নেমকহারামি করতে দেব না।'

—'ওঃ, তোর হিংসে হ'চ্ছে বুঝি?'—রেগে উঠলো শু-রুং।

—মোটেই না, তোর কথা শুনে আমার কিন্তু ভীষণ রাগ হ'চ্ছে।

শু-রুং আর বেশি বাড়াবাড়ি করলো না, কিন্তু বেশ বুঝতে পারা গেল—সে তার মনের ইচ্ছে ত্যাগ করলো না।

শান-হুনি আর তার স্ত্রী দুই ভায়ের কথা সব শুনতে পেয়েছিল। তারা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। কেমন করে এই আগতপ্রায় বিপদ থেকে নিজেদের রক্ষা করবে সেই চিন্তাই তারা করতে লাগলো।

বেশি ভাববার সময় ছিল না। শু-রুং জাহাজের দাঁড়ী ও মাঝিদের ডেকে বললে ঃ

—তোরা যা, ঐ লোকটাকে আর তার চাকরকে ধর। তাদের ধন-রত্ন যা আছে, সব কেড়ে নিয়ে তাদের মেরে ফেল্। স্ত্রীলোকটি কেবল বেঁচে থাকবে।

শু-ইয়েং বাধা দেবার চেষ্টা করলে।

—'নিজের চরকায় তেল দাও গে ঃ রাগে চিৎকার করে উঠলো শু-রুং। 'এখানে আমি কর্তা, আমার হুকুম, সরে যাও।'

শু-ইয়েং তার হুকুম মানতে বাধ্য হ'লো। সঙ্গে সঙ্গে শান-হুনি ও তাঁর ভৃত্যকে হত্যা করা হ'লো। হতভাগ্য জ্ঞানী ব্যক্তির স্ত্রীর চোখের সামনে এই হত্যাকাণ্ড সমাপ্ত হ'লো। স্ত্রীলোকটি পাগলের মত হ'য়ে গেল। স্বামীর পর আর বেঁচে থেকে কি লাভ! 'যাই হোক তবুতো স্বামীর সঙ্গে যা'বো' এই বলে সে সমুদ্রে ঝাঁপ দিল।

কিন্তু শু-রুং তার মাঝিদের সঙ্গে সমুদ্রে ঝাঁপ দিলে স্ত্রীলোকটিকে উদ্ধার করবার জন্যে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই চেং-শীকে সুস্থ শরীরে জাহাজের উপর তোলা হ'লো।

তারপর বদমাশটা কো-কুম-টো দ্বীপের দিকে যাবার আর কোন প্রয়োজন না দেখে জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে দিলে। জাহাজ যেখান থেকে ছেড়ে দিয়েছিল, আবার সেখানে ফিরে এলো। শু-রুং জাহাজ থেকে নেমে গিয়ে একটি বুড়ী স্ত্রীলোককে যোগাড় করে তাকে বললে ঃ "একখানা নৌকায় চড়ে আমার জাহাজে যা। সেখানে একটি স্ত্রীলোককে দেখতে পাবি, তাকে তোর বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে রাখবি।

তাকে খুব আদর-যত্ন করবি, সান্ত্বনা দিবি, আর সাহস দিবি, বুঝলি? সে ভীষণ দুঃখে পড়েছে।'

শু-রুং এর কথামত স্ত্রীলোকটি কাজ শুরু করলে। সে সময় শু-রুং তার লুটের মাল জাহাজ থেকে নামাচ্ছিল। সঙ্গীদের উপর সন্তুষ্ট হ'য়ে সে একটা ভোজে তাদের সকলকে আমন্ত্রণ করলে।

আনন্দোৎসবময় ভোজ। সকলে প্রাণভরে মদ খেয়ে মাতাল হ'য়ে পড়লো। শু-ইয়েং কেবল জ্ঞান হারায় নি। ব্যাপারটা ক্রমশ যে অবস্থায় এসে দাঁড়ালো, সেই কথা ভেবে সে একবারে হতাশ হ'য়ে পড়লো—আর তার কোন ক্ষমতাও ছিল না কিছু করবার। উপস্থিত অবস্থার সুযোগ নিয়ে সে চেষ্টা করতে লাগলো তার ভাইয়ের বন্দিনীকে যদি কিছু সাহায্য করতে পারে। সে উৎসব থেকে সরে গেল। কেউ তা লক্ষ্য করলো না। ত্বরিতপদে সে গেল বৃদ্ধার বাড়ীতে। ঘরে প্রবেশ করবার পূর্বে সে একটু দাঁড়িয়ে শুনলো যদি ঘরের ভিতর থেকে কোন কথা তার কানে আসে। তার কানে এলো চেং-শীর ক্রন্দন, আর এই সব কথা।...

—তোমার বাড়ী কোথা?

—রাজধানীতে।

—সত্যি! আরে আমিও যে পিয়েং ইয়াংএ থাকি।

—তবে তুমি এখানে কি করে এলে?

বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌লেঃ হায়! আজ দশ বছর আমি এখানে বাস করছি। অবশ্য নিজের ইচ্ছেও নয়। তোমার মত আমিও শু-রুংএর হাতে পড়েছিলাম—সে আমার স্বামীকে হত্যা করেছে। প্রতিহিংসা নেবার সুযোগের অপেক্ষায় আছি—কিন্তু এতদিনেও সুযোগ এলো না! ঐ রাক্ষসটা কোন শাস্তি পাবে না!

এই কথা শুনে চেং-শী নিজের দুঃখের কথা ভুলে চোখের জল ফেলতে লাগলো।

এখন সময় শু-ইয়েং প্রবেশ করলো যে ঘরে স্ত্রীলোক দুইজন কথা বলছিল। সে তাদের বল্‌লে—তোমরা এত হতাশ হ'য়ে পড়ো না। হয়তো শীঘ্র তোমাদের উদ্ধার করা হ'বে। একজন তোমাদের উপর নজর রেখেছে। আমার ভাইয়ের পাপ কাজ দেখে আমারই ভয় হয়। শোন আমার কথা। যদি তোমরা পালাতে চাও, তাহলে এমন সুযোগ হারাইও না।

— তা কি সম্ভব ?

—ভয় পেয়ো না তোমরা। এখন সে তোমাদের পিছু নিতে পারবে না। কারণ মদ খেয়ে অজ্ঞান হ'য়ে সে এখন মাটিতে পড়ে আছে। কিন্তু এক মুহূর্ত নষ্ট করবার সময় নেই। তুমি এই দেশে বহুকাল বাস করেছো, সে জন্য এদেশের অজানা তোমার কিছু নেই। এই স্ত্রীলোকটি মাত্র আজ এখানে এসেছে, তুমি একে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও। এই নাও কিছু টাকা, এতে তোমাদের পথের খরচ চলবে। কিন্তু আবার বলছি, আর দেরী কোরোনা।

স্ত্রীলোক দু'জন তাদের রক্ষাকর্তার পায়ের কাছে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে ধন্যবাদ দিলে।

শু-ইয়েং তাদের তুলে আবার বললে যত শীঘ্র সম্ভব পালাবার জন্যে। সে বললে ঃ

—এই সুযোগে তোমরা যতটা পার এগিয়ে যাও শু-রুংএর হাত থেকে বাঁচবার জন্যে। সে যদি তোমাদের আবার ধরতে পারে তা হ'লে তার কি ভীষণ রাগ হ'বে সে-কথাটা ভেবে দেখ।

শু-ইয়েং এর কথায় সাহস পেয়ে স্ত্রীলোক দু'জন পথে বার হ'লো। কিছুদূর পর্যন্ত শু-ইয়েং তাদের সঙ্গে গেল। কিছু পরেই স্ত্রীলোক দুজন

নিঃসঙ্গ ভাবে পথ চলতে লাগলো। তারা তাদের সাধ্যমত দ্রুত পথ চলতে লাগলো। দু'ঘণ্টা পথ চলার পর চেং-শী একটু বিশ্রাম করতে চাইলো। তার সঙ্গিনীও রাজী হ'লো। পরিশ্রান্ত দেহ নিয়ে তারা পথের ধারে বসে পড়লো বিশ্রাম করবার জন্যে। কিছুক্ষণ পর বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি বললে ঃ 'দেখ আমি তোমায় একটা কথা বলতে চাই।'

—বল, আমি তোমার জন্যে কি করতে পারি ?

—দেখ তুমি যদি তোমার পোশাক আমায় খুলে দাও, আর তুমি যদি তার পরিবর্তে আমার পোশাক পর, তাহ'লে আমি ভারী আনন্দিত হই।

চেং-শী'র এ কথায় ভীষণ সন্দেহ হ'লো। ঐ স্ত্রীলোকটির যে কি মতলব তা সে বুঝতে পারলো না ; উপরন্তু বৃদ্ধা তাকে কিছু ভাববার সময়ও দিলে না।

—দেখ, তুমিও আমার মত পরিশ্রান্ত, কিন্তু তুমি যুবতী, সেই কারণে আমার চেয়ে বেশি কষ্ট তুমি সহ্য করতে পারবে। তুমি আমার আগে চলে যাও। যদি শু-রুং এসে হাজির হয়, আমি তাকে বলবো—তুমি কোন্ দিকে গেছ তা আমি জানি না। তুমি পথ চলতে আরম্ভ কর, আর তোমার জুতোজোড়া আমায় দিয়ে যাও, তাহ'লে আমি ভারী খুশি হ'বো।

চেং-শী কাল বিলম্ব না করে উঠে পড়লো। বৃদ্ধার কথায় আনন্দিত হ'য়ে সে তাকে ধন্যবাদ দিলো, কিন্তু সে ধারণাও করতে পারলে না স্ত্রীলোকটির মতলব কি। চেং-শী এগিয়ে চললো।

বৃদ্ধা বললে—দাঁড়াও, কোন্ পথে যেতে হবে বলে দি। প্রথম একেবারে সোজা চলে যাবে। একটা বাঁশ বনের কাছে পৌঁছুবে। সেখানে একটু জিরিয়ে নেবে। তারপর আরও এগিয়ে যাবে যতক্ষণ না "রো-জা"র মন্দির দেখতে পাও। "রো-জা"র মন্দিরের কাছে

পৌঁছলে আর তোমার ভয়ের কোন কারণ থাকবে না। যেমন যেমন বল্‌লাম ঠিক তা করবে।

—অক্ষরে অক্ষরে আমি তোমার কথা মেনে চলবো।

—বেশ, তবে তুমি যাও, ভগবান তোমার রক্ষা করবেন।

চেং-শী একটু এগিয়ে যেতেই বৃদ্ধা উঠলো। কাছেই একটি হ্রদ ছিল। স্ত্রীলোকটি তার সঙ্গিনীর জুতো জোড়া নিয়ে সেই হ্রদের দিকে এগিয়ে চললো। হ্রদের তীরে সে চেং-শী'র জুতোজোড়া রেখে, তরঙ্গসঙ্কুল হ্রদের জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো চোখের জলে ভগবানকে প্রার্থনা করে।

পথ চলতে চলতে চেং-শীর কানে এলো বৃদ্ধার করুণ চিৎকার। সে আবার ফিরে এলো হ্রদের ধারে। সে দেখল একজোড়া সাক্ষির মত তার জুতোজোড়া হ্রদের তীরে রয়েছে, তারপর তার চোখ পড়লো হ্রদের জলে ভাসমান বৃদ্ধার মৃতদেহের উপর। এই দৃশ্যে তার অন্তস্তল পর্যন্ত শিউরে উঠলো।

সে মনে মনে ভাবলে, কেন বৃদ্ধা আত্মহত্যা করলো···তবে কি··· হ্যাঁ, নিশ্চয়ই···সেই জন্যেই সে আমার জুতো জোড়াটা চেয়েছিল! আমায় চলে যেতে বলবার আগে সে আত্মহত্যা করবার মতলব করেছিল। তার মৃত্যু যে কোন কাজে লাগবে না, সে তা চায়নি। আমিই আত্মহত্যা করেছি এইটে প্রমাণ করবার জন্য সে হ্রদের তীরে আমার জুতোজোড়াটা এমনি ভাবে রেখে দিয়েছ। হায়রে হতভাগী, আমায় তুই ভালবাসতিস—স্বর্গে গিয়ে এ ভালবাসার মূল্য পাবি।

চেং-শী যদি নিজের মনের কথাই কেবল শুনতো তা'হলে সে হ্রদের ধারে আরো কিছুক্ষণ বসে থাকতো। মৃত স্ত্রীলোকটির কথা তার মনে পড়লো, সে আর অপেক্ষা না করে চলতে আরম্ভ করলো। শীঘ্রই সে বাঁশবনের কাছে এসে পড়লো। এমন সময় হঠাৎ তার এক

অদ্ভুত বেদনা আরম্ভ হ'লো। ব্যথায় সে থর থর করে কাঁপতে লাগলো। সে বুঝতে পারলে এ তার প্রসব বেদনা। কি বিপদ! একলা! সর্বহারা!! কি হ'বে তার। একটি সন্তান প্রসব করল সে। হতভাগ্য ক্ষুদ্র জীবটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে সে কাঁদতে লাগলো।

—হায়রে হতভাগা, তোকে নিয়ে আমি কি করব। তোর বাপ নেই; আর তোর মা? সে জানে না তার নিজের কি হ'বে!

চেং-শীর গলার আওয়াজ একজনের কানে গেল। বৃদ্ধা তাকে যে মন্দিরের কথা বলেছিল, সেই মন্দিরের সেবাদাসী চেং-শীর কথা শুনতে পেলে। স্ত্রীলোকটি যেদিক থেকে কান্নার শব্দ আসছে সেই দিকে গেল। সামনে একটি স্ত্রীলোককে সদ্যজাত এক শিশুপুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকতে দেখে সেও বড় কম আশ্চর্য হয়নি। যতদূর সম্ভব চেং-শীকে প্রাথমিক সাহায্য করে সে জিজ্ঞেস করলে কেমন করে সে এখানে এলো।

চেং-শী ছোট্ট করে তার দুঃখের গল্প বললে। পূজারিনী তার ইতিহাস শুনে খুবই দুঃখিত হ'লো। সে জিজ্ঞেস করলে—এনখ তুমি কি করবে ঠিক করেছ?

—হায়! আমি তো কিছুই ঠিক করতে পারছিনা। একলা সম্বলহীন আমি, কেমন করে মানুষ করে তুলবো এই শিশুকে? আমায় ছেড়ে যেতেই হ'বে এ শিশুকে। আর আমিও বেশি দিন বাঁচবো না; আমিও মরবো ঠিক করেছি।

—তা হলে তো অবস্থা আরও খারাপ হ'বে। আমার কথা শোন— কোন ভালো লোককে তোমার ছেলেকে অর্পণ কর। আর তুমি আমার সঙ্গে থাক।

—এর চেয়ে বেশি আমি আর কি আশা করতে পারি; কিন্তু ছেলেটিকে কেন তুমি আমার কাছে থাকতে দিচ্ছ না?

—কারণ এ মন্দিরে ছোট ছেলে নিয়ে থাকা বারণ। তোমার পক্ষে ছেলেটিকে ছাড়া কষ্টকর হ'বে, কিন্তু উপায় কি—তোমায় ছেলেটিকে ছাড়তেই হ'বে। ছেলেটিকে বুকে করে তুমি যদি পথের 'পরে এগিয়ে যাও, তাহ'লে শীঘ্রই তোমাকে ডাকাতের হাতে পড়তে হ'বে। এদিকে এ কথা জোর করে কেউই বলতে পারে না যে, তুমি আবার তোমার ছেলেকে খুঁজে পাবে না। হয়তো সে মানুষ হ'য়ে উঠে আবার তোমায় সাহায্য করতে পারবে।

চেং-শী বাধ্য হ'য়েই পূজারিনীর কথায় সায় দিল। নিজের কাপড় ছিঁড়ে ছেলেটিকে বেশ করে ঢেকে দিলে। তারপর তার ইচ্ছে হ'লো ছেলের শরীরে এমন কোন একটি চিহ্ন করে দেয়, যাতে পরে সে তাকে চিনতে পারে। সে শিশুর একটি হাতের উপর কাঁটায় করে স্বামীর নামের অক্ষর কটি এঁকে দিলে। তারপর সেই অক্ষরগুলির উপর চীনের কালি বুলিয়ে দিলে। তার পর নিজের আঙ্গুল থেকে আংটি খুলে নিয়ে, শিশুরগলায় একটি সূতোয় বেঁধে আংটিটি ঝুলিয়ে দিলে; তারপর শিশুকে বুকের উপর জড়িয়ে ধরে পূজারিনীর সঙ্গে চেং-শী এগিয়ে চল্‌লো। প্রথম তাকে যেতে হ'লো গ্রামের রাস্তা ধরে —ছেলেটিকে গ্রামের কোন রাস্তার ধারে ফেলে রেখে মন্দিরে ফেরবার জন্যে।

শীঘ্রই তার চোখ পড়লো পথপ্রান্তে গ্রামের বাড়ীগুলোর উপর। এইখানে শিশুকে শুইয়ে রেখে তাকে বিদায় নিতে হ'বে। হায়রে! যে সন্তানের জন্য সে আর তার স্বামী কত আশা করেছিল, সেই সন্তানকে আজ পথের পরে পরিত্যাগ করতে হ'বে—যেন সে অসতী মায়ের সন্তান! কয়েক দিনের মধ্যে তার উপর দিয়ে বিপদের ঝড় বয়ে গেছে। তার চোখের সামনে স্বামী প্রাণ হারিয়েছে, এইবার তার শিশুকে পথের উপর ফেলে যেতে হ'বে। হতভাগী মায়ের

হৃদয়ে এই সব কথা এক একটা আক্ষেপের মত আসছিল। জীবন্মৃত অবস্থায় চেং-শী শিশুকে শেষ বারের মত বুকে জড়িয়ে ধরে পথের উপর শুইয়ে দিলে। তার পর সাহসে বুক বেঁধে চোখের জল ফেলতে ফেলতে সে এগিয়ে চললো। শিশুর ক্রন্দন তার কানে এসে তার বেদনাকে দ্বিগুণ করে তুললো।

অনেক কষ্টে সে চলছিল—বেদনায় তার সারা শরীর ভেঙ্গে পড়েছিল। পূজারিনী বল্‌লে—ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, আবার একদিন তোমার ছেলেকে খুঁজে পাবে। হ্যাঁ, সে মানুষ হ'য়ে আবার তোমার কাছে ফিরে আসবে—এ কথা আমি নিশ্চয় করে তোমায় বলতে পারি। কিন্তু তুমি সাহসে বুক বাঁধ।

## চার

শু-রুং এর নেশা ছুটতেই তার মনে পড়লো চেং-শী'র কথা। সে দৌড়ে গেল সেই বুড়ীর বাড়ীতে। বাড়ী খালি দেখে সে ভীষণ আশ্চর্য হ'য়ে গেল। সে রাগে চিৎকার করতে লাগলো, কিন্তু কেউ তার কথায় সাড়া দিল না।

তারপর রাগে গরগর করতে করতে সে তার ভাইয়ের কাছে গেল।

—তুমি স্ত্রীলোক দুজনকে দেখেছ?

—না। এখানে আসার পর আমি তো তাদের আর দেখিনি।

—তারা উঠে গেছে, কিন্তু আমি তাদের খুঁজে বার করবো।

শু-রুং তাদের খোঁজে বার হ'লো, শু-ইয়েং তার সঙ্গে গেল। সে ভাবলে—যদি শু-রুং স্ত্রীলোক দুজনের খোঁজ পায়, তা হ'লে রাগে একেবারে ফেটে পড়বে, সে কাছে থাকলে তবু তাদের বিপদে সহায় হ'তে পারবে!

ত্বরিৎ পদে চলতে চলতে দুই ভাই সেই হ্রদের তীরে এসে পড়লো। সেখানে তারা দেখতে পেলো চেং-শীর জুতো হ্রদের ধারে পড়ে রয়েছে, আর হ্রদের জলে মৃতদেহ ভাসছে।

এই দৃশ্য দেখে শু-রুং এর মনও দমে গেল। সে চিৎকার করে উঠলো : হতভাগী ডুবে মরেছে!

—'ভাই', শু-ইয়েং বললে, 'তুমি তো আমার কথা শোননি, এখন তুমি শাস্তি পেলে তো? তুমি ভেবেছিলে স্ত্রীলোকটির উপর প্রভুত্ব করবে, কিন্তু তোমার শত চেষ্টা সত্ত্বেও সে তোমার কবল থেকে পালিয়ে গেছে। আমাদের পক্ষে এ ভীষণ দুর্ভাগ্য।'

রাগত ভাবে শু-রুং বললে—তুই কি বলতে চাস্ আমার দোষে

এমন ব্যাপার ঘটলো ? তোর জন্যেই তো এই বিপদ। কেন তুই আমার বন্দিনীকে পালাতে দিলি ?

এইভাবে দুই ভাই-এ মধ্যে ঝগড়া চলতে লাগলো। তারা ফিরে না গিয়ে গ্রামের দিকে চললো। তারাই প্রথম ছেলেটিকে দেখতে পেলে। শু-রুং ছেলেটিকে দেখে আনন্দিত হ'য়ে, ছেলেটিকে বুকে তুলে নিয়ে বাড়ী চললো। ছেলেটিকে একটি ধাই-মা'র হাতে সঁপে দিয়ে তাকে বলে দিলে ছেলেটিকে দেখাশোনা করতে আর যত্ন করতে।

শু-রুং বহুবার জিজ্ঞেস করেছে স্ত্রীলোক দুটির অন্তর্ধানের কথা তার ভাইকে, কিন্তু কোন উত্তর না পেয়ে ক্রমশ থেমে গেছে।

এখন সে তার সমস্ত সময় লাগিয়ে দিলে ছেলেটির লেখা-পড়ার জন্যে। ছেলেটি যেন তার নিজের ছেলে, এমনিভাবে শু-রুং তাকে মানুষ করতে লাগলো, ছেলেটিও তার লেখাপড়ায় শু-রুংকে খুব সন্তুষ্ট করেছিল। ছেলেটি ছিল খুব সুন্দর আর বুদ্ধিমান। তাড়াতাড়ি ছেলেটি বড় হ'য়ে উঠলো! একদিন সে শু-রুংকে জিজ্ঞেস করলে—

—বাবা, আমার মা কোথায় ?

শু-রুং মহা ফাঁপরে পড়লো, সে উত্তর দিলে—তোকে জন্ম দিয়েই তোর মা মারা গেছে।

শু-রুং নিজেই নিয়ে যায় শিশুকে স্কুলে। শীঘ্রই ছেলেটি বিদ্যালয়ের সব চেয়ে ভালো ছেলে হ'য়ে উঠলো। কিন্তু আবার কতকগুলি ঘটনা ছেলেটির মনে সন্দেহ জাগিয়ে দিলে। একদিন তার লক্ষ্য পড়লো তার হাতের উপরে আঁকা শান-সিয়েং নামের উপর। আর একদিন সে পুরানো জিনিসপত্রের ভেতর থেকে একটা আংটি খুঁজে পেলো। সেই দামী আংটিটিকে সে তাড়াতাড়ি নিজের পকেটে লুকিয়ে ফেললো। নিজের মনে মনে বললো :

—এখন মনে হয় বন্ধুরা যা বলে তা হয় তো সত্যি। সেইদিন থেকে সে কেবল ভাবে কে তার মা-বাপ। শেষে এ সমস্যার সমাধান করবার জন্যে সে স্থির করলে দেশ ভ্রমণে বা'র হ'বে। হয়তো সে একদিন তার পিতামাতাকে খুঁজে পাবে।

যখন তার সতের বছর বয়েস হ'লো, শান-সিয়েং শু-রুং এর অনুমতি চাইলে দেশভ্রমণ করে তার জ্ঞান বৃদ্ধি করবার জন্যে। শু-রুং বাধা দিল না। তার ইচ্ছে ছিল, শান-সিয়েং এর সঙ্গে কারুকে দেয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শান-সিয়েংকে একলাই যেতে দিতে রাজী হ'লো। ঠিক হ'লো শান-সিয়েং দু'বছর বাইরে থাকবে।

কয়েক সপ্তাহ হ'লো শান-সিয়েং দেশ ভ্রমণে বে'র হয়েছে। ভ্রমণ করতে করতে সে একটি দেশে এসে উপস্থিত হ'লো। সে ঠিক করলো কয়েকদিন এদেশে কাটাবে। এতদিন তার ভ্রমণে কোন ঘটনা ঘটে নি। এইবার এল তার ঘটনাপূর্ণ জীবন। প্রথম ঘটনা যা ঘটলো তা খুবই খারাপ। একদিন কয়েকটি ছেলে রাস্তায় খেলা করছিল, শান-সিয়েং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের খেলা দেখছিল। হঠাৎ শান-সিয়েং কেঁপে উঠলো। সে শুনতে পেলে একটি ছোট ছেলে তার বন্ধুকে বলছে ঃ

—তুই ডাকাত শু-রুং কে জানিস্ ?

—নাম শুনেছি, কিন্তু চোখে দেখিনি কখনও।

সকলে এই পাজী লোকটা সম্বন্ধে এক অদ্ভুত গল্প বলে ঃ 'আমার এক বন্ধু তার ছেলে—না, তার পুষ্যিপুত্তুরের সঙ্গে এক সঙ্গে স্কুলে পড়তো। সকলের ধারণা ছেলেটিকে রাস্তার ধারে কুড়িয়ে পায় শু-রুং। কুড়িয়ে পেয়ে তাকে বাড়ী নিয়ে এসে মানুষ করে। লুটের মাল জড় করে সে এখন খুব বড়লোক। সে তার ছেলেকে এখন ভ্রমণ করতে বিদেশে পাঠিয়েছে।

শান-সিয়েং এই সব কথার একটিও শুনতে ভুল করেনি। সে ভীষণ ভাবে উন্মুখ হ'য়ে উঠলো ব্যাপারটা জানবার জন্যে। সে ছেলেটির কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো :

—আমায় ক্ষমা কর, তোমার নাম কি আমায় বলবে? তুমি কি শু-রুংকে চেন?

—না মশাই, লোকটাকে কখনও দেখিনি, তবে অনেক কথা বলতে শুনেছি লোকটার সম্বন্ধে।

এই উত্তরে শান-সিয়েং মোটেই সন্তুষ্ট হ'তে পারলো না। ছেলেটা ভয় পেয়ে গেছে মনে হওয়ায় সে তাকে আর বেশি কিছু জিজ্ঞেস করলো না। সে চলে গেল।

এরপর শান-সিয়েং এসে পৌঁছলো জেন-জু দেশে। পথের শ্রান্তি দূর করবার জন্যে কিছুদিন সে এ শহরে থাকবে স্থির করলে। একটা কোন বাসায় ওঠবার আগে সে ঘুরে ঘুরে শহরের দেখবার মত জিনিসগুলো দেখে নিলে। তার চোখে পড়লো বাগান-ঘেরা একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর উপর। সে সেই বাড়ীর দিকে এগিয়ে গেল এবং বাগানের ভিতর একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়েকে দেখে থমকে দাঁড়ালো। মেয়েটির কাছে যাবার কোন উপায়ই ছিল না। চারিদিক প্রাচীরে ঘেরা। শান-সিয়েংএর মনে ভারী দুঃখ হ'লো। মেয়েটি বাগানের ভিতরই রয়েছে। মেয়েটি যেন পথিকের পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো, তাতে যুবকের অন্তরে পুলক জেগে উঠলো। এটা খুবই সত্যি যে সে এমন দৃশ্য কখনো দেখেনি। মনমোহিনী রূপ, আধ-পাকা ফলের মত টাটকা; চোখের দৃষ্টি যেন তারার জ্যোতিকে হার মানায়; পিঠের উপর কালো চুল, মনে হয় যেন পর্বতপৃষ্ঠে অন্তর্হিত কালো মেঘ। ছোট ছোট দুটি হাত, পাখির উড়ে যাওয়ার চেয়ে হালকা যেন তার চলন। শান-সিয়েংএর আশ্চর্যের আর সীমা ছিল না। সে

মেয়েটির উপর থেকে তার চোখ সরাতে পারলো না। মেয়েটি এদিক ওদিক চলাফেরা করতে করতে যুবকের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল।

শান-সিয়েংএর যেন ভাব লেগেছে—সে স্থাণুর ন্যায় সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো, যতক্ষণ না মেয়েটি অদৃশ্য হ'য়ে গেল। তারপর সে চলে গেল মাথা গুজবার একটা ঠাঁই খুঁজে নেবার জন্যে। সেই কমনীয় মূর্তি, যা'র রূপ তাকে অভিভূত করেছিল, সে-সম্বন্ধে কিছু খোঁজ নিতে হ'বে একথা সে মনে মনে ঠিক করলে। চটিতে ফিরে এসে তার প্রথম কাজই হ'লো সকলকে প্রশ্ন করা ঃ

—অমন সুন্দর বাগান-ঘেরা বাড়ীখানা কার বলতে পার ?

—হ্যাঁ, ওটা একজন ধনী লোকের বাড়ী। মালিকের নাম, ইয়েং-ইয়েন-সা। মালিক মারা গেছে। বাড়ীর বাসিন্দে এখন তার স্ত্রী ও তার মেয়ে।

—মেয়েটির বিয়ে হ'য়েছে ?

—না, এই মোটে তার সতের বছর বয়েস।

শান-সিয়েং-এর মন কতকটা শান্ত হ'লো। সে একলা চিন্তাধারায় নিজেকে ভাসিয়ে দিলে। প্রথম সে ঠিক করলে জেন-জু শহরে আরো কিছু দিন থাকবে। অপরিচিতা মেয়েটিকে দেখবার বাসনায় তার হৃদয় পুড়ে যাচ্ছিল। মেয়েটির কথা সে সব সময় চিন্তা করে। মেয়েটিকে প্রথম সে যে স্থান থেকে দেখেছিল, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে সেই একই জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। হায়রে! সুন্দরী মেয়েটি সর্বদাই ঘরের ভিতরে বন্ধ থাকে। দুঃখে শান-সিয়েং এর মরতে ইচ্ছে হ'লো। একদিন বিকেলে বাপ-মার কথা মনে পড়ে তার মনে ভীষণ কষ্ট হ'চ্ছিল, নিজেকে আনমনা করবার জন্যে সে গান গাইতে আরম্ভ করলে। সে তার বাঁশী নিয়ে বাগানের কাছে এসে এই গানটি বাজাতে লাগলো ঃ

"আমি ধরণীর ছেলে না জানি স্বর্গ না জানি মর্ত্য
একেলা পথিক খুঁজে মরি যারা দিল জনম আমার
উদ্যানের বুকে ফুটে ফুল, নয়ন মোহন তার রূপ,
তুলিবারে চাই উচ্চ তরুশাখে পাই না নাগাল
ইচ্ছা হয় প্রজাপতি হ'য়ে, ব.স সেই ফুলের উপর।"

একমনে শান-সিয়েং বাঁশী বাজিয়ে চলেছে।

মেয়েটি সবই শুনেছে। সে নিজের মনে চিন্তা করতে লাগল—এ অদ্ভুত কথাগুলোর মানে কি? সে ভাবলো ঃ

—যুবক স্বর্গ ও মর্ত্য চেনে না, তার মানে সে মাতাপিতাকে হারিয়েছে। প্রজাপতি হ'য়ে সে একটি ফুলের উপর বসতে চায় অর্থাৎ সে একটি যুবতী মেয়েকে ভালোবাসে।

মেয়েটিব ভারী জানতে ইচ্ছে হ'লো ছেলেটিকে। সে তার ভৃত্যকে পাঠালো—কে গান গায় জানবার জন্যে। যখন সে সব শুনলো, তখন সে ভাবলো—এ কি সেই যুবক যা'কে সে কয়েকদিন আগে বাগানের কাছে বেড়াতে দেখেছিল? মেয়েটিও তার বীণা তুলে নিয়ে গাইলে ঃ

"মাকড়সা জাল পাতে—ফুলের উপরে শাখায় শাখায়
প্রজাপতি আসে না
বাগানের মাঝে করেছি হ্রদ রাজহংস তরে
বৃথা হ'লো তাও
বাগানে গাছ পুঁতেছি কোকিল বাসা বাঁধবে বলে
কিন্তু পাখিরা আমাব ডাক শোনে না।
অবশেষে—পাখি এলো
শীঘ্রই সে আমার কাছে আসবে

ষোড়শ বরষ জীবনের মধুর সময়
যদি সুখী হ'তে চাই—আর বেশিদিন
অপেক্ষা করা উচিত নয়।"

এই কথাগুলি শুনে শান-সিয়েং এর মন আনন্দ-দোলায় দুলে উঠতে লাগলো। তার মনে হ'লো এ তার গানেরই উত্তর। সুখে তার হৃদয় ভরপুর হ'য়ে উঠলো ঃ

—'কাল বিকেলে আমার মন শান্ত হ'বে—কারণ কাল এখানে এসে সেই সুন্দরীর নিশ্চয় দেখা পাবো।' সে বাড়ী ফিরলো, কিন্তু তার ঘুম এলো না।

ওদিকে মেয়েটির মনও ভীষণ চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল। সেও অতিকষ্টে ঘুমালো। স্বপ্নে মেয়েটির পিতা তাকে দেখা দিয়ে বললে—মা, আমাদের বাড়ীর কাছে একটি চটিতে একজন যুবক উঠেছে, তুই তার উপরে নজর রাখিস্। আমার বিশিষ্ট বন্ধু শান-হুনির সন্তান সে। আমার ইচ্ছে তুই এই যুবককে বিয়ে করিস।

মেয়ে উত্তর দিলো, 'আমি তো চিনি না তাকে।'

—চিনিস বই কি মা। বাগান থেকে তুই তাকে দেখেছিস্। সে খুব নামজাদা বংশের সন্তান। তবে আসি মা।

মেয়েটির ইচ্ছে হ'লো পিতাকে আটকে রাখে, কিন্তু তা সম্ভব হ'লো না, দু' চোখের জল ফেলতে ফেলতে সে জেগে উঠলো। জেগে উঠে সে চিন্তা করতে থাকলো স্বপ্নের কথা ঃ 'কি করে আমি আমার বাবার কথামত কাজ করবো। যুবকের সঙ্গে আলাপ করবার একটা উপায় ঠিক করতে হ'বে। আজ বিকেলে আমি বাগানে যা'বো—হয়তো আমি তার দেখা পাবো।'

তার আশা বিফল হ'লো না। রাত্রের অন্ধকার নেমে এলে সে

বাগানে এসে দেখতে পেলো শান-সিয়েংকে। কিন্তু তার সঙ্গে কথা না কয়ে সে তাড়াতাড়ি বাড়ীতে প্রবেশ করলো।

মেয়েটি হঠাৎ এসে হঠাৎ চলে যাওয়ায় শান-সিয়েং নিদারুণ ভাবে আহত হ'লো। যাকে সে ভালোবাসে তা'র সঙ্গে কথা কইতে না পাওয়ায় তার বড় কষ্ট হ'লো, সে ঠিক করলে মেয়েটিকে চিঠি লিখবে। পরদিন বিকেলে সে একখানি চিঠি নিয়ে বাগানের কাছে গেলো। কয়েক মিনিটের জন্যে মেয়েটি বাগানে এলো। ছেলেটি মেয়েটির কাছে এগিয়ে গিয়ে চিঠিখানা মাটির উপর ফেলে দিলো। তারপর সে বাগান থেকে বার হ'য়ে গেলো।

মেয়েটি তাড়াতাড়ি চিঠিখানি কুড়িয়ে নিয়ে পড়লো ঃ

—'আমার সাহস ক্ষমা কোর। কেবলমাত্র কয়েকটি কথা তোমায় বলতে চাই। তুমি কি জান প্রজাপতি কি? প্রজাপতি একটি পতঙ্গ, সে ফুলের খোঁজে উড়ে বেড়ায়। রাতের বেলা জ্বলন্ত দীপকে ফুল মনে করে সে দীপের জলন্ত বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুড়ে মরে।'

মেয়েটি ভাবলো—এ উপমা তো আমাকেই উদ্দেশ্য করে! কাল বিকেলে আমি এ চিঠির উত্তর দিব।

পরের দিন শান-সিয়েং যখন বাগানে এলো, সে দেখলো মেয়েটি আকাশের দিকে দু-বার হাত তুলে চাঁদ দেখিয়ে দিলো—তারপর সে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করলো।

শান-সিয়েং বাড়ী ফিরলো। মনে তার দারুণ বিস্ময় ঃ "মেয়েটি আমায় ইশারা করলো, কিন্তু সে ইশারার মানে কি?"—এই কথা সে ভাবতে লাগলো। অনেকক্ষণ সে চিন্তা করলো। সে অনুমানের পর অনুমান করে যেতে লাগলো। শেষে সে আনন্দে চিৎকার করে উঠলো ঃ 'মনে হয় ইঙ্গিতের অর্থ বুঝিতে পেরেছি। মেয়েটি দু-বার হাত তুললে। অর্থাৎ সে বলতে চায়—দশ। সে আমায় আঙ্গুল দিয়ে

চাঁদ দেখিয়ে দিলে, অর্থাৎ সে বলতে চায় কাল রাত্রে দশটার সময় আমায় যেতে হ'বে তার সাক্ষাতে।"

পরের দিন রাত্রের অপেক্ষায় সে আকুল হ'য়ে রইল। সময়ের বহু পূর্বেই সে বাগানে এসে অপেক্ষা করতে লাগলো। মনে মনে ভাবলো সে ইঙ্গিতের অর্থ ভুল করে নি ত? রাত দশটার সময় মেয়েটি বাগানে এসে হাজির হ'লো। আনন্দে হাসতে হাসতে সে এগিয়ে এসে একটি ঘাসের পাতা ছিঁড়ে নিয়ে ঠোঁটের মধ্যে রাখলে। দেখলে লোকে বলবে সে যেন বাঁশী বাজাচ্ছে—এমন মিষ্টি সুর তার মুখ থেকে বার হ'চ্ছিল। কখন গাছের একটা শুকনো ডাল ভেঙ্গে নিয়ে মাটির উপরের ছোট ছোট গাছের পাতার উপর আঘাত করছিল। শান-সিয়েং মহানন্দে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে তাকে দেখছিল। কাছে এসে মেয়েটি যেন ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়ালো। শান-সিয়েং তার দিকে এগিয়ে গেল। সে ভাবলে, "কি সুন্দর!"—এ-ছাড়া তার মুখ দিয়ে আর কোন কথাই বার হ'লোনা—এমন মোহিত হ'য়ে গিয়েছিলো সে। মেয়েটিও নিস্তব্ধ। শান-সিয়েং ভাবলে—প্রথম কথাতেই আমার প্রেমের গভীরতা প্রকাশ করতে হ'বে, কিন্তু সে ক্ষমতা আমার নেই—আমার প্রতি তার কত দরদ কেমন করে' বুঝবো তা? তার হৃদয়ও কি প্রেমময় ও কোমল, না কুটিলতা এরি মধ্যে প্রবেশ করেছে?

"—একটা ফন্দি করা যা'ক।"

যুবতী দেখলে শান-সিয়েং মাটির উপরে ঢলে পড়লো। এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ না করে মেয়েটি তাকে সাহায্য করতে ছুটে গেল; দুই হাতে তার মাথাটি তুলে ধরে গায়ের ধূলো ঝেড়ে দিতে লাগলো। তারপর ছেলেটিকে ধরে একটি বেঞ্চের উপর নিয়ে গিয়ে বসালো।

শান-সিয়েং এর যেন জ্ঞান ফিরে আসছে, এমনি ভাবে বলতে লাগলো—"আমায় ক্ষমা কর—তোমায় কষ্ট দিয়ে আমি ভারি লজ্জিত।"

—আমায় তো তুমি কোন কষ্টই দাও নি। তোমায় সাহায্য করতে পেয়ে আমি ভারী আনন্দিত হ'য়েছি। একটি প্রশ্ন আমি তোমায় করবো—আমায় অনুমতি দাও। তোমার বাস কোথায়?

—আমি নাম-হাইএ থাকি।

—অনেকদিন হ'লো তুমি কি সে দেশ ছেড়েছ?

—প্রায় দু' মাস হ'লো।

—তুমি অনেক কিছু দেখেছ নিশ্চয়ই ভ্রমণ করতে করতে।

—হ্যাঁ।

—তোমার মা বাবা এখন বেঁচে আছেন?

—না, আমার মা বাবা কেউ নেই। তোমার? তোমার মা বাবা বেঁচে আছেন?

—বাবা মারা গেছেন—মা আমার বেঁচে আছেন। সেদিন বিকেলে তুমিই কি বাঁশী বাজাচ্ছিলে?

—হ্যাঁ। আর তুমিই কি বীণার ঝঙ্কারে আমার গানের উত্তর দিয়েছিলে?

—হ্যাঁ, আমিই!

—সে জন্যে আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। আমার প্রেম···তোমার প্রতি আমার উছল প্রেম, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার হৃদয় ভরে তুলেছে। তুমি আমার গান শুনেছ, আমার গানের উত্তর দিয়েছ, আর আজ বিকেলে তোমার সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি দিয়েছ। সেজন্যে আমার কত যে আনন্দ হ'য়েছে তা তোমায় কেমন করে জানাবো!

—কিন্তু তুমি হঠাৎ এমন অসুস্থ হয়ে পড়লে কেন?

—তোমার প্রেমে আমি জ্ঞানহারা হ'য়েছিলাম। আচ্ছা, তুমি আমার চিঠির উত্তর দাওনি কেন বলতো? তুমি কেবল আমায় ইশারা

করলে ; তোমার ইশারা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। তুমি আমায় রাত দশটার সময় আসতে বলেছিলে। সত্যি নয় কি ?

—হ্যাঁ, তুমি ইঙ্গিতের অর্থ ঠিক বুঝতে পেরেছিলে। তুমি যে খুব বুদ্ধিমান তা আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি আমার হৃদয় জয় করেছ। জেলের জালে জড়িয়ে পড়া মাছের মত আমার অবস্থা হয়েছে।

এই কথার পর শান-সিয়েং মেয়েটির একখানি হাত তুলে নিয়ে চুম্বনে চুম্বনে ভরে দিলে।

—আমি তোমায় এমনি করে জড়িয়ে ফেলতে মোটেই চাইনি। আমার প্রেম, তোমার প্রতি আমার অসীম ভালোবাসা কেবল আমায় বাধ্য করেছে তোমার প্রতি এমন ব্যবহার করতে। কিন্তু, রাত হ'য়ে যাচ্ছে। তোমার অনুপস্থিতি তোমার মা জানতে পারলে উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠবেন। এখন তা হ'লে আমাদের পরস্পরকে ছেড়ে যেতে হ'বে। কাল আবার একই সময়ে আমাদের দেখা হওয়া সম্ভব হ'তে পারে।

যুবতী মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বাড়ীর দিকে এগিয়ে চললো।

নিজের কক্ষে প্রবেশ করে, সন্ধ্যাবেলাকার কথা সে অনেকক্ষণ চিন্তা করলে। সে নিজের মনে মনে বললে, "আমি এই যুবককে ভালোবাসি ; কি সুন্দর সে, কি বুদ্ধিমান সে ! একে যদি আমি আমার হৃদয় সমর্পণ করি, তা হ'লে আমার বাবার কথা মতই কাজ করা হ'বে, আর এ কাজ করার জন্যে আমায় অনুতাপও করতে হ'বে না। যাকে আমি ভালোবাসি তাকে বিয়ে করে বাবার ইচ্ছা পূরণ করবো।"

শান-সিয়েং এর মনেও ঐ এক চিন্তা—"কি সুন্দর তার চেহারা, কত ভালো সে ! তার প্রেমে আমি পাগল। তাকে দেখবার জন্যে কাল বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হ'বে ! তা আমি পারবো না। রাত যে আর কাটতে চায় না।

কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। আবার মেয়েটির সঙ্গে দেখা

করবার সময় এগিয়ে এলো। মেয়েটি তার কাছে এলো—আনন্দোজ্জ্বল তার মুখ। কয়েকটি কথার পর মেয়েটি শান-সিয়েংকে বললেঃ

—চল বাড়ীর ভেতর যাই, সেখানে আমরা নিশ্চিন্ত মনে কথা কইতে পারবো। আমার ঘরে তোমায় নিয়ে যাবো, কেউ আমাদের সেখানে বিরক্ত করবে না।

—কিন্তু তোমার মা, তাকে তোমার ভয় হয় না, তিনি তো সব জেনে ফেলতে পারেন!

—আমার মা বুড়ী হ'য়ে গেছেন—আর তিনি ভীষণ দুর্বল। তাকে ভয় করবার কিছু নেই।

শান-সিয়েং মেয়েটির সঙ্গে গেল। মেয়েটির সাজানো ঘর দেখে সে অবাক্ হ'য়ে গেল। কি নিখুঁত ভাবে, আর কি সুন্দর রুচি অনুযায়ী সাজানো সে ঘর। সে মেয়েটির প্রশংসা করে বললেঃ তুমি কত সুখী!

—আর তুমি, তুমি সুখী নও?

—হায়! আমি আমার মা বাবাকে হারিয়েছি, এখন পৃথিবীতে আমি একা। আমার কাছে আমার জীবনের কোন মূল্য নেই। তুমিই প্রথম আমার জীবনে সুখ দিলে; সেজন্যে আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমায় ছেড়ে যেতে হ'বে তোমাকেও।

—কেন? ছেড়ে যেতে হ'বে কেন? তুমিতো বল্‌লে আমায় ভালোবাস।

—হ্যাঁ, আমি তোমায় ভালোবাসি। এই ভালোবাসাই আমার নতুন ভাগ্য-বিড়ম্বনা, কারণ কখনও আমি তোমায় বিয়ে করতে পারবো না।

—কি বলছ তুমি, বন্ধু?

—আমি কখনও তোমায় বিয়ে করতে পারবো না; কারণ তুমি ধনী আর আমি দরিদ্র।

—ওঃ এই! দুষ্টুমি হ'চ্ছে। এই কথা বলে মেয়েটি শান-সিয়েংকে

নিজের কাছে টেনে নিলে। তুমি কি জানো না আমি তোমায় কত ভালোবাসি—জগতে এমন কিছু কি আছে যা আমায় বাধা দিতে পারে তোমার সঙ্গিনী হ'তে? এস আজই আমাদের মিলন হ'ক। তুমি আর আমাকে ছেড়ে যেওনা। আজ রাত্রে তুমি আমার কাছে থাক, মা বুঝতে পারবে না।

পরস্পরের অধর মিলিত হ'লো বিলম্বিত চুম্বনে। উভয়েই প্রেমের হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্পণ করেছে—এবার পরস্পর পরস্পরের কাছে আত্মসমর্পণ করলে। ভোর হতেই শান-সিয়েং চলে গেল। তার মনে হ'লো সে পৃথিবীর সকল মানুষের অপেক্ষা সুখী। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে সে, যে মেয়েটি আজ তার কাছে আত্মসমর্পণ করে তার সাথী হ'লো, তাকে সে সুখী করবে। রোজ বিকেলে যুবক যায় তার স্ত্রীর কাছে। একদিন রাত্রে মেয়েটির মায়ের ঘুম হ'লো না, সে চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। মেয়েটির ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় সে শুনতে পেলো—তার মেয়ে ঘরের ভিতর কার সঙ্গে কথা বলছে। সে ভীষণ রেগে গেলো। দরজা খোলবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না। তখন সে একজন ভৃত্যকে ডেকে বললে:

—একটা তলোয়ার নিয়ে এসে এই দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাক। প্রথমেই যে এই ঘর থেকে বার হ'বে তাকে তুই হত্যা করবি।

শান-সিয়েং ও তার স্ত্রী এ কথা শুনতে পায়নি। তারা ঘুমিয়ে পড়েছিল। যুবতী স্ত্রী স্বপ্ন দেখলে, তার বাবা এসে বলছেন:

"মা আমার, তোর ভীষণ বিপদ, তোর স্বামীর জীবন বিপন্ন। উঠে পড়ে দেখ দরজার পিছনে কি রয়েছে। তোর স্বামী যাতে পালাতে পারে তার একটা ব্যবস্থা কর—তাকে আমার প্রিয় ঘোড়াটা দে, যাতে সে পালাতে পারে। আমার তলোয়ারখানাও তাকে দিস্। কিছুদিন তাকে ছেড়ে থাকতে হ'বে কিন্তু শেষে আবার তোদের মিলন হ'বে।"

মেয়েটি ঘুম ভেঙ্গে উঠে ধীরে ধীরে দরজা খুলে চাকরটাকে দেখতে পেলে।

—এমনি করে তলোয়ার নিয়ে তুই কি করছিস এখানে?—মেয়েটি তাকে জিজ্ঞেস করলো।

—তোমার মায়ের হুকুমে আমি এখানে পাহারা দিচ্ছি। এই ঘর থেকে যে প্রথম বার হ'বে তাকেই হত্যা করতে হ'বে—এই হুকুম।

—আমার মা পাগল হ'য়ে গেছে। আমার ঘরে কেউ নেই। তোকে একটা কাজ করতে পাঠাবার জন্যে আমি তোকে জাগাতে আসছিলাম। আমায় লিখতে হ'বে, কিন্তু আমার একখানিও কাগজ নেই। আমায় কয়েকখানা কাগজ এনে দিবি?

—আমি তো এখান থেকে নড়তে পারবো না, মা।

—কেন? ওঃ, তোর ভয় হ'চ্ছে বুঝি আমার ঘরের বন্দী লোকটি পালাবে? দে তলোয়ার আমার হাতে, আমি তোর জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকছি, তুই আমায় কাগজ এনে দে।

চাকরটা এ কথায় রাজী হ'লো। সে চলে যেতেই মেয়েটি দৌড়ে গেল তার স্বামীর কাছে এবং বললে "শিগ্‌গির উঠে পড়—তা না হ'লে ভীষণ বিপদে পড়বে। মা জানতে পেরেছেন আমার ঘরে কেউ রয়েছে এবং আমার ঘরের দরজার কাছে একজন প্রহরীকে দাঁড় করিয়ে গেছেন। প্রহরীকে হুকুম দিয়েছে—প্রথম আমার ঘর থেকে যে বা'র হ'বে তাকে হত্যা করবে। তুমি বাগানে গিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা কর।

শান-সিয়েং তাড়াতাড়ি উঠে বাগানে গেল। সেই সময়ে প্রহরী এসে হাজির হ'লো। মেয়েটি তাকে বললে—ঘর থেকে কেউ বার হয়নি। মেয়েটি আরও বললে—আমি এখন বাগানে বেড়াতে যাবো।

মেয়েটি প্রথম গেল ঘোড়াশালায়। বাবার ঘোড়াটি বা'র করে সে

শান-সিয়েং এর কাছে নিয়ে এলো। পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেবার পূর্বে গাঢ় আলিঙ্গনে তারা আবদ্ধ হ'লো। এমনি করে পরস্পরকে ছাড়তে বাধ্য হওয়ায় তারা আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলো। মেয়েটি তার যত মূল্যবান গয়না, আর ধনরত্ন সব শান-সিয়েং এর হাতে তুলে দিলে, আর সেই সঙ্গে তুলে দিলে তার হাতে তার পিতার তলোয়ার। শান-সিয়েং এই সব জিনিস নিতে বাধ্য হ'লো। তারপর সে নিজের আঙ্গুল থেকে সেই অজ্ঞাত আংটিটি খুলে নিয়ে বললো—এই স্মৃতি-চিহ্নটুকু রেখে দাও। এ আমার প্রেমের অভিজ্ঞান। যতদিন আমি বেঁচে থাকব, তোমার নাম করবো—আর আশা করি শীঘ্রই আমি ফিরে আসবো তোমার সঙ্গে দেখা করতে। তবে বিদায়।

বিমর্ষ মনে এগিয়ে চললো শান-সিয়েং। মেয়েটি অশ্রুআপ্লুত নয়নে তার পানে চেয়ে রইল। শান-সিয়েং ক্রমে একটি বনের ভিতর প্রবেশ করলো।

—'যদি এই বনটায় আগুন দিয়ে দিতে পারতাম!' শান-সিয়েং তখন একটা পাহাড় পার হ'চ্ছে।

—পাহাড়টা যদি সমুদ্রে ভেঙ্গে পড়তো, তা হ'লে আরও কিছুক্ষণ তবু আমার স্বামীকে দেখতে পেতাম।

সে আরও কিছুক্ষণ সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলো—বুকে তার গভীর বেদনা। শেষে ধীরে ধীরে সে তার ঘরে ফিরে গেলো; মন তখন তার চলেছে শান-সিয়েং এর ঘোড়ার পিছু পিছু। শান-সিয়েং যে সময় রাজধানীতে এসে পৌছলো, সে সময় প্রজাদের মধ্যে ভীষণ গোলমাল চলেছে। রাজা মারা গেছেন এবং যুবরাজকে চিও-টো দ্বীপে দ্বীপান্তরিত করা হ'য়েছে।

## পাঁচ

সুন-ইয়েন ও শান-হুনির দুর্ভাগ্যের প্রথম কারণ হচ্ছে জা-জীও-মি। তার ভয় করবার মত আর কেউ ছিল না। তার ক্ষমতার আর সীমা নেই। রাজা তাকে গভীরভাবে বিশ্বাস করে, এবং তার উপরই ছেড়ে দিয়েছেন রাজ্য-শাসনের সব ভার। এই সুযোগে জা-জীও-মি তার যত নিজের লোককে বড় বড় পদে নিযুক্ত করলেন। এমনি করে তিনি একজন নিজের লোককে বসালে সৈন্যাধক্ষের পদে আর একজনকে পদচ্যুত করে। এতেও প্রধান মন্ত্রী সন্তুষ্ট হ'লো না। শেষ সীমা পর্যন্তই বা সে কেন যাবে না, কেনই বা সে সিংহাসনে বসবে না? সিংহাসনে বসাটা অবশ্য এখন স্বপ্ন। কিন্তু জা-জীও-মি আশা রাখে স্বপ্নকে একদিন সত্যে পবিণত করতে। সে সুযোগেব অপেক্ষা করছিল। সুযোগ আসতেও দেরী হ'লো না।

রাজার হঠাৎ অসুখ হ'লো। অবস্থা তাঁর খুবই খারাপ হ'লো, চিকিৎসকেরা হাল ছেড়ে দিলেন। তিনি অনুভব করলেন—মানুষের চোখের জলে ভেজা মৃত্যুর পাখা তাকে স্পর্শ করছে। মরবার কিছু পূর্বে তিনি তাঁর প্রধান মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'আমি এবার মরবো। আমার বড় দুঃখ যে আমার পুত্র এখনও অনেক ছোট; রাজ্যশাসন কববার উপযুক্ত বয়স তার এখনও হয়নি। বিদ্রোহী প্রজারা এই সুযোগে বিদ্রোহ করবে। কিন্তু আমার ইচ্ছে যে, আমার পরে আমার পুত্র সিংহাসনে বসে এবং আমি চাই তোমার কাছ থেকে প্রভুভক্তির শেষ নিদর্শন। তুমি কথা দাও—আমার ছেলেকে তুমি সু-পরামর্শ দেবে, তাকে ভালোভাবে রাজ্যশাসন করতে শেখাবে এবং তাকে ভালো করে লেখাপড়া শেখাবে।

জা-জীও-মি ভগবানের নামে শপথ করলে যে সে তার প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। মরণোন্মুখ রাজা পুত্রকে দেখতে চাইলেন। মন্ত্রী দৌড়ে গেল। রাজা পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সময় ঘনিয়ে এলো। রাজা শেষ নিশ্বাস ফেললেন। বেদনাহত পুত্র চিৎকার করে কেঁদে উঠলো, "বাবা! বাবা! আমার একমাত্র অবলম্বন—কেন তুমি আমায় ছেড়ে চলে গেলে বাবা"! শিশু অজ্ঞান হ'য়ে পড়লো।

প্রধান মন্ত্র এই দৃশ্য দেখছিল। সে ভণ্ডামী করে শিশু রাজকুমারকে সান্ত্বনা দিতে লাগলো। তার কথার সঙ্গে চিন্তাধারার মোটেই মিল ছিল না। রাজার মৃত্যুতে সে আনন্দোৎফুল্ল হ'য়ে উঠলো। এতদিন ধরে সে যে আশা করে বসে আছে, এইবার সে তা সফল করতে পারবে।

রাজার শেষকৃত্য সমাপন হ'য়ে গেল—প্রদেশপালরা সব জড় হ'লেন। নূতন রাজার অভিষেক করতে হ'বে। প্রদেশপালরা ঠিক করলেন মৃত রাজার পুত্রই রাজা হ'বে। এই কথায় জা-জীও-মি ক্ষেপে গেল। সে চিৎকার করে বলে উঠলো, "রাজকুমারের এখন রাজা হ'বার বয়েস হয়নি, সে এখন দেশ-শাসনের কাজ চালাতে পারবে না।" এরকম হাতে রাজ্য-শাসনের ভার পড়লে দেশের কি যে অবস্থা হবে, তার ভয়াবহ দৃশ্য জা-জীও-মি বর্ণনা করলে। তা'ছাড়া মরবার সময় রাজা বলে গেছেন, রাজকুমার যতদিন না রাজকার্যের উপযুক্ত হয় ততদিন আমি রাজা হবো।

মন্ত্রী ভেবেছিল এই কথায় সুফল ফলবে। প্রদেশপালরা মুখ চাওয়া-চায়ি করলেন, কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না।

প্রদেশপালদের অবস্থা দেখে জা-জীও-মি'র এক মুহূর্ত বুঝতে দেরী হলোনা তাদের মনোগত ভাব কি। ভালো কথায় বোঝানো

ছেড়ে এবার সে নিজ মূর্তি ধরলো। সে প্রধান সেনাপতিকে পাঠিয়ে বললে ঃ "যে নগরপাল আমার বিরুদ্ধাচরণ করবে, তাকেই কারাগারে বন্দী করে রাখবে।"

নগরপালরা যদিও ভয় খেয়ে গেলেন, তবুও তারা জা-জীও-মি'র মতে মত দিলেন না। তখন জা-জীও-মি, তাদের মধ্যে সবচেয়ে যারা ক্ষমতাশালী, এবং যাদের প্রজার উপরে প্রভাব আছে, তাদের দ্বীপান্তরে পাঠাবার হুকুম দিলেন।

এমনি ভাবে নগরপালদের দমন করে, তিনি গেলেন রাজকুমারের কাছে। রাজকুমারকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করে বললে ঃ

"সর্বশক্তিমান রাজকুমার—তোমার এই কষ্টের সময় আমি তোমায় বিরক্ত করতে সাহস করছি, আমায় সে জন্যে মার্জনা করো ; প্রজাদের প্রয়োজনে কয়েকটা বিষয় সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে কথা কইবার প্রয়োজন, তাই, তা না হলে তোমায় এ অবস্থায় আমি বিরক্ত করতে আসতাম না।

—'বলুন', যুবরাজ বললেন।

—তুমি তো জানো দার্শনিক কং-জী বলে গেছেন—বয়েস না হ'লে কারোও রাজ্য-শাসন করা উচিত নয়। তুমি খুব বুদ্ধিমান, কাজ-কর্ম চালাবার শক্তিও তোমার যথেষ্ট আছে—কিন্তু একলা রাজ্য-শাসন করবার মতন বয়স তোমার হয়নি। তোমার বাবা, স্বর্গগত প্রভু, মরবার সময় রাজ্য-শাসনের ভার গ্রহণ করতে আমায় বলে গেছেন, যতদিন না তুমি নিজে সে কাজ করবার উপযুক্ত হও। তোমার পরলোকগত পিতার শেষ কথা তোমায় বলতে, তোমার দুঃখ বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু কি করবো ? আমার বিশ্বাস আছে তুমি তোমার বাবার ইচ্ছে মত আর দার্শনিকদের কথা মত কাজ করবে।

জা-জীও-মি ভেবেছিল, রাজকুমারকে এই সব যুক্তি দেখিয়ে

ভুল বোঝাতে পারবে। কিন্তু সে ভয়ানক আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলো, যখন যুবরাজ বললেন ঃ

"তোমার মনোমত করে, তোমার স্বার্থ বজায় রাখবার জন্যে আমার পিতার শেষ ইচ্ছার ব্যাখ্যা করছো। তিনি তোমায় বলে গেছেন আমায় পরামর্শ দিতে, আর আমায় চালিয়ে নিতে; তিনি তো একবারও বলেন নি আমার পরিবর্তে তোমাকে রাজ্যের কর্ণধার হতে। জেনে রাখো, নিজেই আমি রাজ্যশাসনের ভার নেব। আমার আর কিছু বলবার নেই।"

একে বলে মিষ্টি কথায় বিদায় দেওয়া। যুবরাজের হুকুম মেনে নেওয়ার ভান করে জা-জীও-মি পিছু হেঁটে চলে যেতে যেতে বললেন ঃ "মহারাজের ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।"

যুবরাজের মনের দৃঢ়তার কাছে এমনি করে প্রধান মন্ত্রী বাধা পেলো কিন্তু সে দমে গেল না। যুবরাজ নিজের ইচ্ছায় যখন তাকে সিংহাসনে বসতে দিলেন না, তখন জোর করে সে সিংহাসন দখল করবে। রাজ্যের কর্মচারীরা জা-জীও-মিকে ভালবাসতেন, কারণ জা-জীও-মির্ জন্যেই তাদের উঁচুপদ। প্রজাদের ভয় করবার কিছু নেই, কারণ আজ তাদের শাসন করবার লোকের অভাব। তারপর, একদিন হঠাৎ যুবরাজকে বন্দী করে চিও-টোতে দ্বীপান্তরিত করা হলো। প্রধান মন্ত্রীর হুকুম হলো দিনরাত রাজকুমার প্রহরীর চোখে চোখে থাকবে।

এইবার জা-জীও-মি হলো রাজ্যের সর্বময় কর্তা। সে ভাবলো, সত্যিকারের রাজার ভয় আর তাকে করতে হবে না। এখন সে ফন্দি করে পাওয়া সিংহাসনে তার জীবনের দিনগুলো নির্বিঘ্নে কাটাতে পারবে।

এই সব ঘটনা কোরিয়ায় ভীষণ গোলমালের সৃষ্টি করলো।

প্রজারা জা-জীও-মির ব্যবস্থায় বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগলো। কিন্তু একেবারে খোলাখুলি ভাবে তারা কিছু বলতে সাহস করলো না। দেশময় প্রধান মন্ত্রীকে নিয়ে আলোচনা। রাস্তায় রাস্তায় লোকের ভিড় জমা হয়, আর জা-জীও-মি সম্বন্ধে উত্তেজিত আলোচনা চলে। একদিন শান-সিয়েং রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে দেখতে পেলো এইরূপ লোকের ভিড়। সে তাড়াতাড়ি তার চটিতে ফিরে, চটির মালিককে জিজ্ঞেস করলেঃ "ব্যাপার কি? দেখলাম দেশের লোকেরা ভীষণ উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছে। কারণ কি?"

—সে কি, তুমি কিছুই জান না? সকলে বলছে—জা-জীও-মিকে কেউ পছন্দ করে না। তার অখ্যাতির চূড়ান্ত করেছে সে যুবরাজকে দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে। রাজকুমার কোথায় সিংহাসনে বসবেন, না তাঁকে কারাগারে বাস করতে হচ্ছে।

শান-সিয়েং ভীষণ দুঃখিত হলো। তার উন্নত মনের সাড়া শুনে সে ঠিক করলে হতভাগ্য রাজকুমারকে যেমন করে পারে সাহায্য করবে।

সেই রাত্রে সে স্বপ্ন দেখলো। স্বপ্ন তাব মনের ইচ্ছাকে আরো দৃঢ় করে তুললো। স্বপ্নে সে একজন লোককে দেখতে পেলে—ভ্রমণ করতে করতে সে এই লোকটিকে দেখেছে। লোকটি তাকে জিজ্ঞেস করলেঃ

—তোমার নাম কি?

—আমার নাম শান-সিয়েং।

—বেশ, আমিও ঐ এক বংশের লোক। আমার নাম শান-হুনি। রাজধানী থেকে জা-জীও-মি আমায় দ্বীপান্তরে পাঠায়। আমাব যাবার কথা ছিল কো-কুম-টো দেশে। কিন্তু পথে ডাকাত শু-রুং আমাকে হত্যা করে। শোন তোমায় কিছু বলবার আছে। উপস্থিত

রাজকুমারকে চিও-টো দেশে দ্বীপান্তরিত করা হ'য়েছে। সেও জা-জীও-মির কবলে পড়েছে। তুমি যাও তাকে সাহায্য করগে।

তার ইচ্ছেই ছিল রাজকুমারকে সাহায্য করবার। সে তার মনের কথা জানিয়ে জিজ্ঞেস করলে ঃ

—আমার মা-বাবার খবর কি তুমি আমায় কিছু বলতে পার না?

—এখন সে সম্বন্ধে তোমায় কিছু বলা আমার পক্ষে অসম্ভব।

শান-সিয়েং এর ঘুম ভেঙ্গে গেল। কিন্তু স্বপ্নের সব কথা তার মনে রইলো।

শু-রুংকে ঘিরে একি কুহেলি? যাকে সে তার পিতা বলে জানতো, লোকে তাকে বলে ডাকাত, এখন হলো সে খুনী। এই সব বিষয় যুবককে চিন্তিত করে তুললে। যাই হোক, এখন তার প্রথম কাজ হচ্ছে রাজকুমারকে সাহায্য করা। শান-সিয়েং চিও-টো'র পথে বেরিয়ে পড়লো।

এই দ্বীপটিতে যাওয়া খুব সোজা ছিল। কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর অনুমতি-পত্র ভিন্ন সে দ্বীপে নামা সম্ভব ছিল না। শান-সিয়েং বৃথা চেষ্টা করলো প্রহরীদের ফাঁকি দিতে। সে বেশ বুঝতে পারলো সে দ্বীপে পৌছানো তার পক্ষে এখন অসম্ভব। কিন্তু সে দমে গেল না, সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকলো।

## ছয়

পাঠকদের হয়তো মনে আছে হতভাগ্য সুন-ইয়েনের মেয়ে চেং-ই'র কথা—যে পিতাকে সাহায্য করবার জন্যে কয়েকজন কোরীয় বণিকের সঙ্গে পীত সমুদ্রে নিজের জীবন বিসর্জন দিতে চলেছে।

বণিকদের জাহাজ ক্রমশ মাঝ দরিয়ায় পৌছালো। বণিকেরা প্রার্থনার ব্যবস্থা করে চেং-ইকে নিয়ে এসে বল্লে—বিসর্জনের সময় এসেছে। এখন তুমি নিজের দেহকে পূত করে এসো। সবচেয়ে সুন্দর পোশাকে সাজো। তোমার জন্যে আমি এখানে অপেক্ষা করে রইলাম।

বণিকদের কথা অনুযায়ী চেং-ই কাজ করলে। শীঘ্রই সে জাহাজের পাটাতনের উপর এসে হাজির হ'লো। সদ্য-স্নাত গোলাপের মত তার রূপ! দেখলে লোকে বলবে সে যেন বিয়ের কনে, কে বলবে সে মৃত্যুমুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে চলেছে।

পাটাতনের মাঝখানে একটা বড় টেবিল। টেবিলের রং সাদা। এই হলো বলিদানের বেদী। বেদীর মাঝখানে একটি ধুনো দেবার পাত্র। সেই পাত্র থেকে কুণ্ডলীকৃত সুগন্ধি ধোঁয়া উঠছে। বেদীর চারধারে একটি করে বাতি। সমুদ্রের হিল্লোলে দীপ-শিখা কম্পিত।

মেয়েটিকে দাঁড় করানো হ'লো ধূপদানীর সুমুখে। বণিকেরা নত-জানু হয়ে প্রার্থনা আরম্ভ করলো। চেং-ইও তার আত্মা ভগবানকে সমর্পণ করলে। নিজের জন্যে সে একবারও ভাবছে না। যত চিন্তা তার পিতার জন্যে, যাকে সে সঙ্গীহীন অবস্থায় ধরণীর বুকে ফেলে চললো।

প্রার্থনা শেষ হ'লো, যুবতী ঝাঁপিয়ে পড়লো সমুদ্রের বুকে—একটুও চঞ্চল হ'লো না তার মন। জাহাজ দূরে চলে যেতে লাগলো,

চেং-ই কয়েক মিনিটের মধ্যে মৃত্যুর অপেক্ষা করতে লাগলো। কিন্তু আশ্চর্য, সে তো ডুবলো না! সমুদ্রের বুকের উপরেই সে ভাসতে লাগলো। জলের উপর পড়ে সে কিসে বাধা পেলে, সে বাধা আর কিছুই নয়, সমুদ্রের এক বিরাট কচ্ছপ। জন্তুটার পিঠে হঠাৎ এত বড় একটা ভার এসে পড়লো, কিন্তু তার কোন খেয়ালই নেই, সে সাঁতার কেটে চললো। মেয়েটিও কোন বাধা দিল না—তার মনে যেন গভীর শান্তি—সে ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুমাতে ঘুমাতে সে স্বপ্ন দেখলে। স্বপ্নে তার মা দেখা দিলেন। তিনি যেন মেঘের উপরে ভাসতে ভাসতে তার কাছে এসে বল্‌লেন: "কন্যা আমার, ভয় পাস্ নি। শোন্, আমি তোকে যা বলতে চাই, আমার কথামত ঠিক কাজ করবি। কচ্ছপটা যতক্ষণ না তোকে তীরে পৌঁছে দেয়, ততক্ষণ তাকে ছাড়িস্ নি।" এই কথা বলে তার মা অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন।

ঘুম ভেঙ্গে উঠে চেং-ই দেখলে সামনেই এক দ্বীপ। নিজের মনে মনে বললে—হয়তো ঐ দ্বীপেই আমায় থাকতে হ'বে। স্বপ্ন এরই মধ্যে সত্যে পরিণত হ'তে চলেছে! মা'র কথা তো আমার বেশ ভালো ভাবেই মনে রয়েছে।

কচ্ছপটা তীরের দিকে এগিয়ে এসে একটা সুরঙ্গের ভেতর দিয়ে সাঁতার কেটে চললো। অনেকক্ষণ পর কচ্ছপটা এক জায়গায় এসে দাঁড়াতে চেং-ই তার পিঠের উপর থেকে মাটির উপর লাফিয়ে পড়লো। তার মুখ থেকে যেন আপনা থেকেই বা'র হ'লো: "আমার জীবন-দাতা, তোমায় নমস্কার।" জন্তুটা সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চললো। মেয়েটি চেষ্টা করলো তার অবস্থাটা একবার ভালো করে বুঝে নিতে। গভীর অন্ধকার, সে ভয় পেয়ে গেলো। হায়, আমি কি হতভাগী। মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচলাম বটে, কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য মাত্র। এই সুরঙ্গ থেকে আমি বার হ'ব কেমন করে। হঠাৎ যেন বিপুল সূর্যরশ্মি

এসে পড়লো সেই সুরঙ্গের ভিতর, তার চোখে ধাঁধাঁ লেগে গেল। সে আলোর দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেলে—তুটি সুন্দর বোতল পড়ে রয়েছে, তার পাশে একখানা চিঠি। চিঠিখানা চেং-ই'র নামেই লেখা। এইমাত্র মেয়েটির জীবনে যে বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে, তারপর এ ঘটনায় মেয়েটি বিশেষ আশ্চর্যান্বিত হ'লে না। এক আশ্চর্য ঘটনা থেকে সে আর এক আশ্চর্য ঘটনার মধ্যে এসে পড়ছে। চিঠিখানি খুলে সে পড়লো ঃ 'এই বোতল তুটির ভিতর যা আছে খেয়ে ফেল। একটিতে তোমার শ্রান্তি দূর হ'বে, আর একটিতে তোমার চিত্তবিভ্রম দূর হ'বে। যে সব অদ্ভুত ঘটনা তোমার জীবনে ঘটলো, তা'তে তোমার চিত্তবিভ্রম হওয়াই সম্ভব।'

চেং-ই সেই তুইটি বোতলের পানীয় পান করলে। মনে হলো যেন তার সর্বাঙ্গে একটা বিরাট শক্তির পুনর্জন্ম হ'চ্ছে। তার মন সম্পূর্ণ ভাবে স্বচ্ছ হ'য়ে উঠলো। যেখান দিয়ে সূর্যরশ্মি আসছিল, হাত ও পায়ের উপর ভর দিয়ে সে সেই দিকে এগিয়ে চললো। কিছুদূর যাওয়ার পর সে আর এগুতে পারলো না, তখন সে হাত দিয়ে মাটি সরিয়ে ফেলতে লাগলো। শীঘ্রই খানিকটা জায়গা পরিষ্কার হ'য়ে যেতে সুরঙ্গের গায়ে একটা ফোকর হ'য়ে গেল। চেং-ই সেই ফোকরের ভেতর দিয়ে এসে পড়লো একটা বিরাট গাছের ফাঁপা গুঁড়ির ভেতরে। গাছের শিকড়গুলো সেই সুরঙ্গের ভেতর পর্যন্ত নেমে গেছে।

দিনের উজ্জ্বল আলোর সোহাগে চেং-ই নিজেকে ভাসিয়ে দিলে। সে যেন এক মায়াকাননে এসে পড়েছে। বাগানময় সবুজ পাতায় ভরা গাছ, মৌমাছির নিঃশ্বাসে নুয়ে পড়া ফুল; মিষ্টি গন্ধে ভরা মৃত্নু মলয়। বাগানটা উঁচু প্রাচীরে ঘেরা। মাঝখানে একখানি সুন্দর বাড়ী।

কয়েক মিনিট বিশ্রাম করা'র পর মেয়েটি, ডালপালা সরিয়ে

গাছের গুঁড়ির ভেতর থেকে লাফিয়ে পড়লো হাল্কা পায়ে, তার পর এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলো সে।

এই বাড়ীতেই রাজকুমারকে বন্দী করে রাখা হ'য়েছিল। কয়েক মাস হ'য়ে গেছে রাজকুমার এখানে তার বন্দী-জীবন কাটাচ্ছে। গভীর বেদনা তার বুকে। তার চিন্তা থেকে জনক-জননীর স্মৃতিকে মুছে ফেলতে পারে না সে। দিন-রাত সে মাতা-পিতার চিন্তা করে, কত স্নেহ দিয়ে তারা তার জীবন ঘিরে রেখেছিল। এক একবার সে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে। এই অবস্থা থেকে বাঁচবার উপায় একমাত্র মৃত্যু ছাড়া আর কিছু তো দেখতে পায় না।

তবে কেন এ জীবন রাখা। এই অসীম নির্জনতা যে জীবনের নিষ্ঠুর পরিহাস! হ্যাঁ, এরচেয়ে মরাই ভালো! মনে মনে ভাবে যুবক রাজকুমার—তার বিষাদ-মাখা মুখ দেখে পাখিরও মুখের গান থেমে যায়।

সেইদিন থেকে রাজকুমার স্থির করলে তার ইচ্ছেই পূর্ণ করতে হ'বে। আত্মহত্যার যা কিছু প্রয়োজন সবই ঠিক করা হ'লো। বাগানের একদিকে গাছের ডালে একগাছা শক্ত দড়ি বাঁধা হ'য়েছে—সেই দড়ির অপর প্রান্ত গলায় বেঁধে রাজকুমার তার বন্দী জীবনকে মুক্ত করবে। জা-জীও-মির হতভাগ্য শিকার, তার শেষ প্রার্থনা করে নিলো। আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তার শরীর সেই দড়ির প্রান্তে মরণ দোলায় দুলবে···কিন্তু···যুবক রাজকুমার ইতস্ততঃ করতে লাগলো।

কিছু দূরেই সে দেখতে পেলো একটি সুন্দরী মেয়ে, যেন একটি শ্বেত প্রতিমূর্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে ছায়ায়-ভরা বাগানের অলিতে।

কে এই মেয়েটি? রাজকুমার নিজের মনে মনে জিজ্ঞেস করলে। তাহ'লে এখানে কি আমি একা নই? এ রহস্য উদ্ঘাটন করতে হ'বে।

রাজকুমার মরণের সংকল্প ত্যাগ করলো। তার মনের বিষাদময় ভাব দূর হ'য়ে গেল। তার গলায় পরান দড়ির ফাঁস খুলে ফেলে সে চিন্তা করতে থাকলো—কি করে মেয়েটির কাছে যাওয়া যায়। তার সব চেষ্টা বিফল হ'লো, মেয়েটি একটা বড় গাছের আশে পাশে ঘুরতে ঘুরতে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। সবই যেন মায়ার খেলা!

যুবক রাজকুমার হতবুদ্ধি হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তার সন্দেহ হ'লো—এতক্ষণ হয় তো সে স্বপ্ন দেখছিল। কিন্তু তাতো নয়, সে তো বেশ ভালো ভাবেই দেখেছে। ক্রমশ রাত হ'লো, রাজকুমার বাড়ীর ভেতর প্রবেশ করলো। বৃথাই সে ঘুমোবার চেষ্টা করলো। বাগানের মেয়েটি যেন তাকে ভূতের মত পেয়ে বসলো।

তখনও ভালো করে দিনের আলো ফুটে ওঠেনি, রাজকুমার তাড়াতাড়ি জামা কাপড় পরে বাগানে এলো।

একটা প্রজাপতি তার চারধারে উড়ে বেড়াতে লাগলো। সে প্রজাপতিকে ধরবার চেষ্টা করলো, সফল হ'লো না। রাজকুমারও ছাড়বার পাত্র নয়, সে প্রজাপতির পিছু পিছু ছুটতে লাগলো। হঠাৎ প্রজাপতি অদৃশ্য হ'য়ে গেল। পতঙ্গটা একটা গাছের ফাঁপা গুঁড়ির ভিতর প্রবেশ করলো। রাজকুমারও সেই গাছের গুঁড়ির কাছে হাজির হ'লো। তার মনে হ'লো—এইবার তার শিকারের আর পালাবার উপায় নেই। সে দুই হাত বাড়িয়ে প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো। সে অপেক্ষা করছিল একটা প্রজাপতিকে দেখবার জন্যে। পরিবর্তে দেখলে একটি সুন্দরী যুবতীকে। ভীষণ ভাবে আশ্চর্যান্বিত হ'য়ে রাজকুমার পিছিয়ে গেল। কিন্তু শীঘ্রই নিজেকে সংযত করে নিয়ে বললে :

—আমায় ক্ষমা করুন এমনি করে আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে। আমি একটা প্রজাপতিকে ধরবার জন্যে তার পিছু নিয়ে

ছিলাম। প্রজাপতিটা এই গাছের কোটরে আশ্রয় নিল—তাকে ধরবার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে আপনাকে দেখতে পেলাম।

চেং-ই'র প্রয়োজন ছিল এই সব কথার, নিজের সংশয় দূর করবার জন্যে। যুবকের দেখা পেয়ে সে ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো। রাজকুমার বললো ঃ

—আপনি ভয় পেয়ে গেছেন, আমি সে জন্যে ভীষণ দুঃখিত। কোথায় থাকেন, জিজ্ঞেস করতে পারি কি ?

—আমার পিতামাতা কেউ নেই, আমার দেশও নেই। সমুদ্রের ধারে বেড়াতে বেড়াতে সমুদ্রের জলে পড়ে গেলাম। একটা কচ্ছপ আমায় এই দ্বীপে পৌঁছে দিলে, কয়েক দিন হ'লো আমি এখানেই রয়েছি।

—আমারও বাপ-মা নেই। কোরিয়ার মৃত রাজার কুমার আমি। বাবার মৃত্যুর পর প্রধান মন্ত্রী আমায় দ্বীপান্তরিত করেছে। আসুন না আমার বাড়ীতে, কয়েক মিনিট বিশ্রাম করবেন—কোন আপত্তি আছে কি ?

—ধন্যবাদ! সানন্দে। কিন্তু আপনি তো বন্দী, আপনার ইচ্ছে মত কাজ করবার অধিকার নেই।

—আপনি ভুল করছেন। আমি বন্দী সত্য, কিন্তু কেউ আমার নির্জনতা নষ্ট করতে আসে না। বাড়ীর চারদিকে উঁচু প্রাচীর, প্রাচীরের পাশে প্রহরীরা পাহারা দিচ্ছে—সেই জন্যে আমাকে পাহারা দেবার প্রয়োজন আছে তা কেউ মনে করে না। আপনি নির্ভয়ে আমার সঙ্গে আসতে পারেন। আসুন।

চেং-ই যুবকের সঙ্গে গেল। হাত ধরাধরি করে তারা বাড়ীর দিকে এগিয়ে গেল। যেতে যেতে তারা কথা কইতে লাগলো।

—'এইটে তোমার ঘর'—এই কথা বলে রাজকুমার চলে গেল।

চেং-ই একা একা চিন্তা করতে লাগলো সমস্ত ঘটনা সম্বন্ধে। যুবক সুন্দর, মধুর স্বভাব, আমারই মত সে হতভাগ্য! কি-শি একেবারে ভুলে গিয়েছিলো যে কয়েক মিনিট পূর্বে সে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল—এখন তার মন ভরে গেল সেই যুবতী মেয়েটির চিন্তায়। প্রতিদিন একজন প্রহরী তাকে খাবার দিয়ে যেতো। প্রহরী এসে হাজির হওয়ায় রাজকুমারের চমক ভাঙলো। রাজকুমার বললো :

—রেখে যাও, আজ নিজেই আমি নিয়ে খাব। তুমি যাও।

প্রহরী চলে গেলে কি-শি গেল মেয়েটির খোঁজে।

—আমার সঙ্গে খাবে? রাজকুমার জিজ্ঞেস করলে।

—নিশ্চয়।

তারা খেতে বসলো। রাজকুমার বললো :

—আজ আমার কী আনন্দ, তবু খাবার সময় একজন সঙ্গী পেলাম!

—কেন?

—বহুদিন ধরে তো আমি এখানে একলা রয়েছি!

—সত্যিই তো—আপনার ভীষণ কষ্ট হয় একা একা থাকতে, নয়?

এই সব কত কথা তারা বলতে লাগলো। খাওয়া শেষ হ'লে তারা বাগানে নামলো। যুবরাজ তার দুর্ভাগ্যের কথা সব চেং-ইকে বললে। চেং-ই উত্তর দিলে :

—দুঃখু করবেন না। ধৈর্য ধরুন, কিছুদিন পর আবার যখন আপনি সিংহাসনে বসবেন তখন সব ভুলে যাবেন।

—না, রাজা আমি আর হ'তে পারবো না। জা-জীও-মি আমায় হত্যা করবে।

—নিরাশ হ'বেন না। দেখবেন আপনার ভবিষ্যৎ আবার হাসবে।

এমনি করে দিনের পর দিন কেটে যায়। একদিন বিকালে তারা

তুজনে অভ্যাস মত বাগানে একটি বেঞ্চে বসে আছে। যুবরাজ তুঃখের হাসি হেসে বৃক্ষছায়ার অন্তরালে কতকগুলি কবরের দিকে চেং-ই'র দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। চেং-ই জিজ্ঞেস করলে ঃ

—তুমি অমন করে হাসছ কেন ?

—কেন ? স্বপ্নময় স্বরে রাজকুমার বললে ঃ আমি জীবনের কথা ভাবছি—জীবন-ভরা কেবল নিরাশা, আর তুঃখ। ঐ কীট-পতঙ্গের মত আমাদের জীবন—এক মুহূর্তের জন্যে কেবল বেঁচে থাকা। মান সম্ভ্রমের আশা করি, কিন্তু কেন, কি লাভে ! কারণ মরণ যখন তার উষ্ণীষের অন্তরালে আমাদের সকলকে জড় করবে, সকলে তখন সমান হয়ে যাবো। প্রেম ও বন্ধুত্বই কেবল আমাদের পরস্পরকে বেঁধে রাখে।

সে চুপ করে চারদিকে চেয়ে দেখলো। প্রকৃতির অবস্থা আর তার মনের অবস্থার সঙ্গে যেন একটা বিপরীত মিল রয়েছে। বুকে তার গভীর বেদনা। প্রকৃতি যেন আনন্দ-উচ্ছল। চারদিকে ফুল ফুটে আছে, পতঙ্গের দল আর পাখীর দল প্রেমের খেলা খেলছে।

মেয়েটির কানের লাল পলার তুল রাজার মাথা ছুঁয়ে গেল। তিনি বললেন ঃ

—দেখছ তো ঐ প্রজাপতিটাকে। ঐ দেখ, একটা সাদা ফুলের উপর বসেছে। দেখলে মনে হয় নাকি ও ফুলটির গন্ধের আঘ্রাণ নিচ্ছে, ফুলটিকে চুম্বন করছে ! হায় কীট-পতঙ্গরাও আমাদের অপেক্ষা কত সুখী !

চেং-ই কি ভাবছে। সে ভাবছে রাজকুমারের জীবনের ঘটনা, যা'র জন্যে রাজকুমার এমন করে নিজের জীবনকে তুচ্ছ করছে। সে আরও ভাবছে, প্রকৃতিময় প্রেমের খেলা দেখে—তার মনেও কি প্রেমের সাড়া জাগবে না। হয়তো বা সে তার জীবনের সঙ্গীর কাছে এসে পড়েছে। সে রাজকুমারকে বললো ঃ

—আপনার দুঃখকে দূর করুন। চিরকাল আপনি হতভাগ্য থাকবেন না। শীতের পর বসন্ত আসে, অশ্রুর পর হাসি। চাঁদ সময়ে সময়ে উজ্জ্বল হ'য়ে আকাশে ওঠে। সে সূর্যকে ভালোবাসে—রাত্রে সে সূর্যেরই পিছু পিছু যায়। বৃষ্টি আসবে; এরই মধ্যে মাটি ভিজে উঠেছে।

সোনালী কুয়াশার অন্তরালে সূর্য দিগন্তে ডুবে গেল। পাখীরা তাদের কুলায় ফিরলো। সারা প্রকৃতির বুকে যেন একটা গভীর প্রশান্তি বিস্তার করতে লাগলো। যুবরাজ চেং-ইর সুন্দর ও সরু হাত ধরে বললেন :

—আমি তোমায় ভালোবাসি।

—আমিও তোমায় ভালোবাসি : মেয়েটি উত্তর দিলো।

আরও কিছুক্ষণ তারা পাশা-পাশি বসে রইলো। কারো মুখে কোন কথা নেই। উভয়েই তখন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, পরস্পর পরস্পরের ভালোবাসার কথা ভাবছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর রাজকুমার বললো :

—সাধারণতঃ বাপ-মা'ই ছেলে-মেয়ের বিয়ের কাজটা সম্পন্ন করে। আমাদের দুজনেরই বাপ-মা নেই, কেমন করে আমাদের মিলন হ'বে ?

মেয়েটি বলল :

—নিজেদেরই আমাদের বিয়ের সব কাজ করতে হ'বে।

—বেশ, তা' হ'লে সব যোগাড় করি, এস।

তারা একটি টেবিল পেতে তার উপর লাল কাপড় ঢাকা দিয়ে দুটি বাতি ( জীবন ) জ্বেলে দিলে। ফুলে ভরা দুটি ফুলদানি ( যৌবন ), সূঁচ-সুতো ( মিলন ), একটি ধুপদানি, টেবিলের উপর রেখে টেবিলটিকে সাজিয়ে, সেই টেবিলের সুমুখে যুবক-যুবতী নতজানু হ'য়ে বসলো। প্রার্থনা করার পর একই পাত্রে উৎসর্গিত মদ্য উভয়ে পান করলো।

কাজ শেষ হ'য়ে গেল। তারপর অতি আনন্দে তাদের দিন কাটতে লাগলো।

একদিন রাত্রে রাজকুমার স্বপ্ন দেখলেন: একটি মাথা-ভাঙ্গা বোতল, তা-থেকে রক্ত বার হচ্ছে। চমকে জেগে উঠলেন রাজকুমার। তিনি তার সঙ্গিনীকে জাগিয়ে বললেন—"জা-জীও-মি আমায় হত্যা করতে আসছে। তোমায় ছেড়ে যেতে হ'বে। শোন, আমি কি স্বপ্ন দেখলাম।"

চেং-ই'ও হতাশ হ'য়ে পড়ে বললে, "এস আমরা বাঁচবার চেষ্টা করি। আমরা বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে সমুদ্রের ধারে পালিয়ে যাই চল। তাহ'লে জা-জীও-মি ভাববে আমরা পুড়ে মরেছি।"

—না বৃথা চেষ্টা। যে স্বপ্ন আমি দেখলাম—তা থেকে বেশ বুঝতে পারছি, যে বিপদ আমার উপর ভেঙ্গে পড়বে, তা থেকে আমার বাঁচবার কোন আশাই নেই।

—কিন্তু মনে হয় তুমি ভুল বুঝছো ; তোমার স্বপ্নকে বৃথা তুমি ভয় পাচ্ছ। একটা বোতলের মাথা ভেঙ্গে গেলে সকলে বোতলটাকে একটা মূর্তির মত সসম্ভ্রমে নিয়ে যায়। এমনি করেই প্রজারা তোমার সৌভাগ্যকে বয়ে নিয়ে আসবে। আর রক্তটা হ'চ্ছে লাল রং-এর রাজ-পরিচ্ছদের প্রতীক ·····

কি-শি এ কথায় সন্তুষ্ট হ'তে পারলো না। তবু সে বল্‌লে :

—চল তবে—এইখানে আমি অনেক চোখের জল ফেলেছি, আগুনে পুড়ে জায়গাটা ছাই হ'য়ে যা'ক।

বাড়ীর চারদিকে আগুন জ্বেলে দিয়ে তারা বাগানের দিকে গেল। যে গাছের কোটরে কি-শি তার ভবিষ্যতের সঙ্গিনীর দেখা পেয়েছিল, তারা সেই গাছের কাছে এসে পড়লো। গাছের কোটর দিয়ে তারা সুরঙ্গের ভেতর এসে পড়লো। এগিয়ে চললো তারা সমুদ্রের দিকে। তারা সমুদ্রের তীরে এসে হাজির হ'লো।

আর তো এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়! তাদের নৌকা নেই পার হ'বার। রাজকুমার ভাবলে,—জা-জীও-মির হাতে ধরা পড়ার চেয়ে তার এইখানেই মরা ভালো। ছুটে চললো সে সমুদ্রের দিকে। বিদ্যুতের মত ত্বরিতে চেং-ই তার স্বামীর পোশাক চেপে ধরে তাকে থামিয়ে ভর্ৎসনার স্বরে বললে ঃ

—তুমি আমায় এমনি করে অসহায় অবস্থায় ফেলে যেতে চাও কেন? যদি তুমি মরতেই চাও, তা হলে এস আমরা এক সঙ্গে মরি।

—না! তুমি যুবতী। ভাগ্যবশতঃ আমি তোমার দেখা পেয়েছি। তোমার ভাগ্য আমার সঙ্গে বাঁধা হ'য়ে যাবে! এতো ঠিক নয়। আমার ছেড়ে দাও, একলা মরতে দাও আমায়।

কিন্তু চেং-ই আকুল ভাবে তার স্বামীকে জড়িয়ে ধরে রইলো। ঐ অন্ধকার আবর্তে সে স্বামীর সঙ্গে এক সঙ্গে ঝাঁপ দেবে—আগেই সে ঝাঁপ দিতে চায়।

## সাত

কয়েক মাস ধরে শান-সিয়েং সুযোগের অপেক্ষা করছিল রাজকুমার যে দ্বীপে দ্বীপান্তরিত হয়েছিল সেই দ্বীপে যাবার। কিন্তু বৃথাই তার অপেক্ষা করা। সে ক্রমশ হতাশ হ'য়ে পড়ছিল। একদিন সে একটা নতুন স্বপ্ন দেখলে।

শান-হুনি যুবককে দেখা দিলেন। তিনি বললেনঃ একখানা জাহাজ নিয়ে ঐ দ্বীপের পূর্ব প্রান্তে যাও। তুমি সেখানে দেখতে পাবে যুবরাজ আর তার স্ত্রীকে। তাড়াতাড়ি যাও, তা না হলে জীবন্ত রাজকুমারের আর দেখা পাবে না।

এই নতুন স্বপ্নে বিশ্বাস করে শান-সিয়েং অনতিবিলম্বে নির্দিষ্ট স্থানে হাজির হলো। তীরে পৌঁছবার আগেই সে দেখতে পেলো—একটি যুবক ও একটি যুবতী উত্তেজিত ভাবে কথা কইছে। মনে হলো চুম্বনের মত হালকা হাওয়া তার কানে কয়েকটি কথা পৌঁছে দিলো—সে বুঝতে পারলো উভয়ের মধ্যে ভীষণ একটা ঝগড়া চলছে। সে তাদের কাছে এসে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞেস করলোঃ

—বসন্ত এমন সুন্দর হাসছে তোমাদের চারিদিকে, আর তোমরা দুজনে ঝগড়া করছো ?

কি-শি উত্তর দিলোঃ

—আমাদের সমুদ্র পার হতে হবে, কিন্তু পার হবার মত কোন অবলম্বন আমাদের নেই, সে জন্যে আমরা মরতে চাই। কিন্তু আমি চাইনা আমার সঙ্গিনী আমার সঙ্গে মৃত্যুর মুখে জীবন বিসর্জন দেয়। কিন্তু সে চায় আমার সঙ্গে এক সঙ্গে মরতে। এই নিয়ে আমার ঝগড়া।

—এখন আপনাদের এরূপ গভীর চিন্তা ত্যাগ করুন দেখি। আর মরণের চিন্তা করতে হবে না। আমার জাহাজ আপনাদের হাতে তুলে দিচ্ছি। যেখানে যেতে চাইবেন জাহাজ আপনাদের সেখানেই পৌঁছে দেবে।

'ধন্যবাদ, তুমি আমাদের জীবন দান করলে'—চিৎকার করে বললে কি-শি।

সঙ্গে সঙ্গে যুবরাজ ও তার স্ত্রী জাহাজে উঠলো। চাং-ইয়াং শহর থেকে, সমুদ্রের একটা শাখা যেখানটায় চিংও-টো দ্বীপটাকে আলাদা করে দিয়েছে, সেই সমুদ্রটুকু শান-সিয়েং শীঘ্রই তাদের পার করে দিলে।

যখন তারা তীরে এসে পৌঁছলো, তখন কি-শি শান-সিয়েংকে বল্‌লে তাকে একটা স্থান নির্দেশ করে দিতে, যেখানে সে তার স্ত্রীকে নিয়ে উঠতে পারে।

শান-সিয়েং নিজের চটিতেই উঠতে বল্‌লো। তারা রাজী হ'লো। এতদূর পর্যন্ত শান-সিয়েং এর স্বপ্ন সত্যে পরিণত হলো। এখন কেবল তার জানবার বাকি রইল, যাদের সে ফিরিয়ে নিয়ে এলো তারা সত্যিই রাজকুমার ও তার স্ত্রী কিনা। কাজটা বড় সোজা নয় যুবক-যুবতীকে সে কথা জিজ্ঞেস করা!···না সে একেবারেই অসম্ভব। তারা নিজেদের পরিচয় গোপন করবে। শান-সিয়েং সুযোগের অপেক্ষায় রইলো।

এদিকে যুবক-যুবতী যখন পলায়ন করছে—রাজকুমারের বাড়ী অর্থাৎ রাজধানী থেকে দ্বীপান্তরিত হ'য়ে এতদিনে সে যে বাড়ীতে বাস করছিল, সেই বাড়ীতে দাউ দাউ করে আগুন জলে উঠলো। যে প্রহরী কি-শি'র কাছে পাহারায় থাকতো সে দৌড়ালো প্রধান প্রহরীকে খবর দিতে, যার উপরে জা-জীও-মি চিও-টো দ্বীপ

পাহারা দেবার ভার দিয়েছিল। প্রধান প্রহরী তো ভীষণ ফাঁপরে পড়লো, সে হুকুম দিলো ভালো করে পাহারা দিতে। যে কেউ বাড়ী থেকে বার হ'বে তাকেই বন্দী করা হ'বে।

আর কতকগুলি সৈনিকের উপর আদেশ হ'লো আগুন নেভানোর—কিন্তু তখন আর সময় নেই, সারা বাড়ীখানা একটা বিরাট অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হ'য়েছে তখন। প্রধান প্রহরী হুকুম করলো ঃ

—রাজকুমারকে চারদিকে অন্বেষণ কর। যদি সে মরে না থাকে তাহ'লে সে নিশ্চয় বাগানে লুকিয়ে আছে। বাগানের অলি-গলিতে তাকে খুঁজে বার কর।

কিন্তু রাজকুমারের কোন খোঁজই পাওয়া গেল না। প্রধান প্রহরী ঠিক করলো তার বন্দী নিশ্চয় আগুনে পুড়ে মরে গেছে। সে কথা সে তৎক্ষণাৎ জা-জীও-মিকে জানালো।

এই সংবাদে প্রধান মন্ত্রীর আর আনন্দের সীমা রইল না। রাজকুমারের মৃত্যুতে তাঁর পথের শেষ কাঁটাও সরে গেল, এখন তাঁর সাথে বাদ সাধতে আর কেউ রইলো না সে তৎক্ষণাৎ চিও-টো'র প্রধান প্রহরীকে ডেকে পাঠালে—ছুটে এলো প্রধান প্রহরী।

—'কী সৌভাগ্য!' জা-জীও-মি প্রহরীকে বললেন—'এত বড় একটা ঘটনার জন্যে আমাদের আনন্দ করা উচিত। যাও, বিরাট এক উৎসবের আয়োজন করোগে, সব বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করো।'

জা-জীও-মির প্রিয় ভৃত্যরা সকলেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠলো উৎসবময় জীবন। তারা চিৎকার করে জা-জীও-মির গুণগান করতে লাগলো।

—এখন জা-জীও-মি কোরিয়ার ভবিষ্যৎ রাজা! প্রজাদের মধ্যে কিন্তু উঠলো অসন্তুষ্টির গুঞ্জন ধ্বনি। অত্যাচারীর ভয়ে তারা তাদের অসন্তুষ্টি জোর গলায় জানাতে সাহস করলো না।

জা-জীও-মি ভাবলো কি-শি মারা গেছে। কিন্তু এদিকে কি-শি চাং-ইয়াং দেশেই বাস করছে। একদিন যখন রাজকুমার শান-সিয়েংএর সঙ্গে কথা বলছে, সেই সময় চটির মালিক দৌড়ে এলো তাদের কাছে। সে বললে:

—রাস্তায় ভীষণ উত্তেজনা! দলে দলে লোক রাজধানীতে যাচ্ছে।

—তাতে আশ্চর্য হ'বার কী আছে?—শান-সিয়েং জিজ্ঞেস করলে।

—এই লোকগুলোই আমাদের রাজকুমারের পাহারায় ছিল চিও-টো দ্বীপে। সকলের ধারণা হতভাগ্য রাজকুমার আগুনে পুড়ে মরে গেছে। সেই কারণেই প্রহরীরা ফিরে আসছে। প্রজারা জা-জীও-মিকে দেখতে পারে না, সৈন্যদল জা-জীও-মির দিকে। সৈন্যদল রাখার খরচ কোরিয়ার উপর লোহার ভারী জোয়ালের মত চেপে বসেছে।

—তুমিও কি জা-জীও-মিকে পছন্দ কর না?—জিজ্ঞেস করলে শান-সিয়েং?

—সকলের মতই।

—কিন্তু জা-জীও-মিকে সিংহাসনচ্যুত করা তো সোজা নয়? তার সৈন্যদল র'য়েছে—সৈন্যদল প্রজাকে দেখতে পারে না।

—আপনি মশাই ভুল করছেন। যে সৈন্যদল রাজধানীতে রয়েছে সেই সৈন্যদলই কেবল জা-জীও-মিকে ভালোবাসে। অন্য সৈন্যরা তার বিপক্ষে। আমাদের শহরে যে সৈন্যদল রয়েছে তারা জা-জীও-মির বিরুদ্ধে। আমাদের দেশের চীনা শাসনকর্তা যদি আমাদের দেশের সৈন্যদলের কাছে তাঁর প্রার্থনা জানান—এবং অন্যান্য চীনা শাসনকর্তারা যদি একযোগে কাজ করেন, তা হ'লে জা-জীও-মির সঙ্গে সহজেই যুদ্ধ আরম্ভ করা যায়।

—কিন্তু জা-জীও-মি সিংহাসন-চ্যুত হ'লে কে বসবে সিংহাসনে ?

—হ্যাঁ, একটা সমস্যা বটে। দুঃখের বিষয় রাজকুমার পরলোকগত। রাজবংশের কাউকে হয়তো খুঁজে পাওয়া যেতে পারে—তার উপরে সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত করলেই চলবে।

—আর, ভাগ্যক্রমে রাজকুমার যদি মরে না থাকেন ?

—তাহ'লে তো কাজ খুব সোজা হ'য়ে গেল—উত্তরাধিকারী সূত্রে সে বাপের সিংহাসনে বসবে।

—ঠিক কথাই বলেছ। প্রজারা তো তোমায় খুব ভালোবাসে আর তুমি তো চীনা শাসনকর্তার বন্ধু। তা হ'লে চেষ্টা করা যা'ক, কি বল ?

—নিশ্চয়ই। আমরা দুজনে কাজ করি এসো। কিন্তু এখন আমায় যেতে হ'বে।

শান-সিয়েং কি-শিকে বললে ঃ

—তুমি আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে জা-জীও-মির সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে ?

এই কথায় রাজকুমার অজ্ঞান হ'য়ে মাটির উপর ঢলে পড়লো।

শান-সিয়েং তাকে যত্ন করতে লাগলো। মনে হ'লো রাজকুমার যেন মরে গেছে। শান-সিয়েং চেং-ইকে ডাকলো। দৌড়ে এলো চেং-ই। কি ঘটেছে শান-হুনির পুত্র সবই তাকে বললে। যুবতী স্ত্রী তার স্বামীর বুকের উপর পড়ে অশ্রুবর্ষণ করতে লাগলো। শান-সিয়েং এ দৃশ্যে ভীষণ ভাবে আহত হ'য়ে বললে ঃ "ভগবানের দোহাই—কে তোমরা ?"

—আমি তোমায় বিশ্বাস করি। তুমি একবার আমাদের প্রাণ রক্ষা করেছ। আমি তোমায় সত্যি কথা বলছি। আমার স্বামী রাজপুত্র, জা-জীও-মি'র শিকার। ভাগ্যক্রমে তার সঙ্গে আমার পরিচয়।

আমি সমুদ্রের জলে পড়ে যাই, একটা কচ্ছপ আমার প্রাণ রক্ষা করে এবং আমাকে নিয়ে যায় রাজকুমার যে দ্বীপে দ্বীপান্তরিত হ'য়েছিল সেই দ্বীপে। আমি তার স্ত্রী হ'য়েছি। তারপর আমরা দুজনে বার হ'য়েছি কারাগার থেকে। তুমি আমাদের জীবন দিয়ে এখানে নিয়ে এসেছ। এই আমাদের ইতিহাস। এখন তো বুঝতে পারলে সব ব্যাপার?

রাজার জ্ঞান ফিরে এলো। শান-সিয়েং হেঁটে কিছু দূরে সরে গিয়ে বল্‌লে ঃ

—মহারাজ, আমায় ক্ষমা করবেন।

কিন্তু কি-শি চুপ করে রইলো।

—না মহারাজ। আমি আপনার সঙ্গে এতদিন যেভাবে ব্যবহার করেছি, সেজন্য প্রথম আমায় ক্ষমা করতে হ'বে। কার সঙ্গে ব্যবহার করছি তা আমি জানতাম না, এই আমার একমাত্র ওজর। এখন যখন আমি সব জেনেছি, তখন আর আমি একঘরে আপনার সঙ্গে থাকতে পারবো না।

এমন সময় চটির মালিক সেখানে প্রবেশ করলো। শান-সিয়েং তাকে সব কথা জানালো। চটির মালিক রাজকুমারকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে বললে ঃ

—আমার আজ কি সৌভাগ্য, মহারাজ আমার চটিতে বাস করছেন!

ছুটলো সে চীনা শাসনকর্তার কাছে। চীনা শাসনকর্তা তো একেবারে অবাক্—মনের আনন্দ প্রকাশ করতেও সে ভুলে গেল। অনতিবিলম্বে বিরাট সৈন্যদল নিয়ে সে চটিতে এসে হাজির হ'লো। সৈন্যদল সারা বাড়ীখানি ঘিরে ফেললো। চীনা শাসনকর্তা তার পোশাক পরে রাজকুমারকে অভিনন্দন জানাতে গেল।

রাজকুমার তাকে সসম্মানে সম্বর্ধনা করলেন। রাজকুমারের পাশে

ছিল শান-সিয়েং। শান-সিয়েং রাজাকে অভিনন্দন জানিয়ে চীনা শাসনকর্তাকে বললে ঃ

—আপনাদের সম্রাটকে টৌ-উওন প্রাসাদে নিয়ে যেতে হ'বে। টৌ-উওন ছাড়া রাজার মর্যাদা দেবার মত বাড়ী আর নেই।

চীনা শাসনকর্তা রাজী হ'লেন। সঙ্গে সঙ্গে সকলে টৌ-উওনের পথে চললো।

বাড়ীতে প্রবেশ করেই রাজকুমার শান-সিয়েংকে ডাকল।

—আমি আমার রাষ্ট্রকে নতুন করে গঠন করতে চাই।

—মহারাজ, আমার সকল শক্তি আপনার হাতে সমর্পণ করছি—সসম্ভ্রমে উত্তর দিলে শান-সিয়েং।

—বেশ, তবে আমি তোমায় আমার প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত করলাম।

শান-সিয়েং হতবুদ্ধি হ'য়ে গেল। রাজার হুকুম, মানতেই হ'বে তাকে। রাজকুমার তার পরিচিত সকলকে একে একে রাজকার্যের বিভিন্ন পদে নিযুক্ত করলেন। তিনি হুকুম করলেন এক বিরাট উৎসবের আয়োজন করতে, আর চারিদিকে লোক পাঠিয়ে তার আগমন বার্তা প্রজাদের মধ্যে প্রচার করতে।

এই সংবাদ প্রজাবর্গের মধ্যে এক অস্বাভাবিক আনন্দের সৃষ্টি করলো। চারদিকে আনন্দের গান উঠলো ঃ

"আমাদের প্রিয় রাজা! দিনের আগমনে রাত চলে গেছে। দুর্ভাগ্যের দিন চলে গেছে, সৌভাগ্যের দিন এসেছে। সূর্য মেঘে আবরিত হয়েছিল, আলোর অভাবে গাছপালা শুকিয়ে যাচ্ছিল; কিন্তু হাওয়ায় এখন মেঘাবরণ সরে গেছে। আলো ফুটে উঠেছে। সূর্যের স্বাস্থ্যকর আলোকে সব আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছে—পুত্র, ভ্রাতা, আয় সকলে ছুটে আয়—আগুন, জল, পাহাড় কিছুই যেন আর

তোদের বাধা দিতে না পারে। সকল বাঁধন ভেঙ্গে ফেল্। নিষ্ঠুরেরা যদি তোদের বাধা দেয়, হত্যা কর তাদের। কেবল চেয়ে থাক সূর্যের পানে। সূর্যের উত্তপ্ত রশ্মি তোদের শক্তি দেবে, সাহস দেবে। রাজা, আমাদের প্রিয় রাজা, তোমায় চিনতে পেরেছি আমরা। তোমাকে আমরা যেন চিরকাল আমাদের কাছে রাখতে পারি! এখন প্রেমের সঙ্গে সন্ধি করে, সকলে ছুটে চল যুদ্ধ করতে।

প্রজারা যখন এমনি করে তাদের আনন্দ প্রকাশ করছে, রাজকুমার তখন চিন্তা করছে রাজ্য-অপহারককে কি উপায়ে সিংহাসন-চ্যুত করা যায়। তিনি শান-সিয়েংকে জিজ্ঞেস করলেন, তাঁরা রাজধানী থেকে কত দূরে আছেন। শান-সিয়েং বললে "তাঁরা রাজধানী থেকে অনেক দূরে"। সেনাপতির পরামর্শে রাজা ঠিক করলেন অবিলম্বে অভিযান শুরু করবেন।

শান-সিয়েং সৈন্য নিয়ে ব্যস্ত। সৈন্যদের কষ্টসহিষ্ণু করে তোলবার জন্যে তাদের পায়ে ভারী বালির বস্তা বেঁধে দিলেন। সারাদিন তারা ঘুরে বেড়াবে সেই ভারী বালির বস্তা পায়ে বেঁধে।

দু-এক দিনের মধ্যে সৈন্যদল অভিযানে বার হ'লো। সৈন্যদের সঙ্গে অস্ত্র ছাড়া আর কিছু ছিল না, সে কারণে তারা অতি দ্রুত এগিয়ে চললো। দু-দিনের মধ্যেই তারা রাজধানীর সামনে এসে হাজির হ'লো। শান-সিয়েং রাজধানীর চারদিকে সৈন্য দাঁড় করিয়ে হুকুম দিলেন—কেউ যেন রাজধানী থেকে বার হ'তে বা রাজধানীর ভিতর প্রবেশ করতে না পারে।

তারপর সে বাঁশপাতায় এক ঘোষণা-পত্র লিখে রাজধানীময় ছড়িয়ে দিলো। এই ঘোষণা পত্রে লেখা ছিল—বৈধ রাজা সৈন্যদল নিয়ে উপস্থিত হ'য়েছেন। তিনি এসেছেন বিশ্বাসঘাতক জা-জীও-মি'র সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

এদিয়ে জা-জীও-মি জানতো তার ভয়ের আর কোন কারণ নেই। উৎসবের পর উৎসব চলছে। হঠাৎ সে জানতে পারলো সৈন্য সমেত সম্রাট এসে উপস্থিত রাজধানীর দ্বারে, আর রাজধানীর প্রজারা ভীষণ উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছে।

জা-জীও-মি'র আশ্চর্যের আর সীমা রইলো না। তৎক্ষণাৎ সে তার সেনাপতিকে ডেকে পাঠালো। সে রাগে একেবারে ফেটে পড়ে বললোঃ "কি রকম! তুমি না বলেছিলে রাজকুমার মরে গেছে? আর সকলে বলছে সে আমার রাজধানী অবরোধ করছে। সৈন্যদল চালনার ভার নিয়েছে কে?

—রাজপুত্র কিছুতেই নয়, তার একেবারে অসম্ভব। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, রাজকুমার আগুনের শিখায় পুড়ে মরেছে। নিশ্চয় কোন বদমাশ কতকগুলো অকেজোকে জড় করে এসে হাজির হ'য়েছে।

তাদের আর বেশি কথা কইবার সময় হ'লো না। প্রজারা বাঁশপাতায় লেখা ঘোষণা-পত্র পড়ে ক্ষেপে উঠেছে। তারা এরই মধ্যে প্রধান মন্ত্রীর প্রাসাদের দ্বারে এসে হাজির হ'য়েছে। সব লুট-পাট করে তারা জা-জীও-মী ও তার সেনাপতিকে বন্দী করে ফেললো, প্রাসাদে আগুন লাগিয়ে দিলো। ঠিক সেই সময়ে রাজা শহরের ভেতর প্রবেশ করছিলেন। প্রজারা তাঁর হাতে প্রধান মন্ত্রী ও তার সেনাপতিকে তুলে দিলে।

কি-শি তার প্রধান সেনাপতি শান-সিয়েংকে ডেকে পাঠালেন।

—কাউকে যেন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া না হয়। এখন দোষীদের কেবল কারাগারে নিক্ষেপ করা হ'ক।

কিছু পরেই তিনি হুকুম দিলেন, জা-জীও-মি, সেনাপতি ও জা-জীও-মির সহচরদের ব্যতীত আর কারুকে যেন বন্দী করে রাখা না হয়।

রাজা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেই হুকুম দিলেন—করের হার কমিয়ে দিতে। তাঁর স্ত্রী রাজার কাজের খুব প্রশংসা করলেন। তিনি বললেন ঃ

—কে জানে, চীনা শাসনকর্তারা যদি যথাযথভাবে হুকুম না মানে এবং নিজেদের লাভের আশায় প্রজার উপরে চাপ দিতে থাকে। এখন প্রয়োজন হ'চ্ছে তোমার কর্মচারীদের পাঠিয়ে অনুসন্ধান করা—সকলে আদেশ মত কাজ করছে কিনা।

রাজা রানীর কথার মর্ম বুঝতে পারলেন। তিনি শান-সিয়েংকে বিশ্বস্ত লোকদের চারদিকে পাঠাতে বললেন। নতুন সেনাপতি নিজেও রাজধানী ছাড়লেন। সে নিজের পোশাক পরে সেনাপতির পোশাক ছাড়লো।

## আট

কেবলমাত্র শান-সিয়েং এর চেষ্টায় ও তার শক্তিতে যথার্থই মহারাজ আবার কোরিয়ার সিংহাসনে বসলেন। কিন্তু সে ভাবলে তার কাজ এখনও শেষ হয় নি। তার এখনও বাকি রয়েছে নিজের বাপ মাকে খুঁজে বার করা এবং যে মেয়েটি তাকে সর্বস্ব সমর্পণ করেছে তার কাছে ফিরে যাওয়া। তার জীবনে এত সব ঘটনা ঘটলো কিন্তু সে এক মুহূর্তের জন্যেও ইয়াং-সো-ইয়েয়ীর কথা ভোলে নি। সে একবার ধারণাও করতে পারে নি যে ইয়াং-সো-ইয়েয়ীর জীবনেও নানা ঘটনা ঘটেছে।

শান-সিয়েং চলে গেলে পর একদিন ইয়াং-সো-ইয়েয়ী দেখলে যে তার মা মরে পড়ে আছে। বেদনায় হতভাগ্য মেয়েটি আকুল হয়ে উঠলো। সে কিছুতেই নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারলে না—তার উপর তার নিঃসঙ্গ অবস্থা তার বেদনাকে আরও বাড়িয়ে তুললে। শীঘ্রই এক নতুন বিপদ তার উপর ভেঙ্গে পড়লো। অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রজারা বিপ্লব আরম্ভ করলে—চারদিকে লুটতরাজ আর অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ হ'লো। ইয়াং-সো-ইয়েয়ী অনেক কষ্টে এক গুপ্তদ্বার দিয়ে পালিয়ে গেল।

কয়েক মাসের মধ্যেই মেয়েটি তার মা ও তার ধনসম্পত্তি সব হারালো। কিন্তু সে নিরাশ হ'লো না। নিজের মনে মনে সে বললো, "আমার শান-সিয়েং তো আছে। যাই আমি তাকে রাজধানীতে খুঁজে পাবো।" সহজে তার কাজ উদ্ধার করবার জন্যে সে পুরুষের বেশ ধরলো। বেরিয়ে পড়লো সে পথের উপর।

দুঃখের বিষয় পথের সঙ্গে পরিচয় তার ছিল না। সে শীঘ্রই

পথ হারিয়ে ফেললে। তার উপর গাঢ় কুয়াশা তাকে আরও মুস্কিলে ফেললে। মেয়েটি বহুক্ষণ পথ চললো, কিন্তু দুঃখের বিষয় বিশ্রাম নেবার জন্যে একখানিও বাড়ী দেখতে পেলে না। কষ্টে সে একটা বাঁশবনের কাছে বসে পড়লো। ঠিক করেছিল সে কয়েক মিনিট বিশ্রাম করবে ; কিন্তু অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও সে জেগে থাকতে পারলো না ; অবিলম্বে ঘুমিয়ে পড়লো।

ভাগ্যবশতঃ ইয়াং-সো-ইয়েয়ী যে বাঁশবনের কাছে এসে পড়েছিল, সেই বাঁশবনেই চেং-শীও শান-সিয়েংকে জন্ম দেয়। হতভাগ্য মাতা পুত্রকে পথ প্রান্তে পরিত্যাগ করে নিজে হ'লো দেবতার সেবাদাসী ; এই স্থানটিতে সে প্রায় ছুটে আসে তীর্থদর্শন করবার জন্য এবং তার বুকে জেগে ওঠে বেদনাময় স্মৃতি। এই স্থানে বসে সে চিন্তা করে—যে স্থানটুকুর উপর তার জননী হ'বার সৌভাগ্য হ'য়েছিল, সেই স্থানটুকুকে সে চোখের জলে ভরিয়ে দেয়।

একদিন সে সেই বেদনার স্মৃতিভরা স্থানে এসে দেখলো—একজন যুবক পথপ্রান্তে শুয়ে গভীর ভাবে নিদ্রা যাচ্ছে। প্রথমে সে ভয় পেয়ে গেল। কিছু পরে সে সাহস করে যুবককে লক্ষ্য করতে লাগলো ঃ "এ যুবকের ঘুম-ভাঙ্গার অপেক্ষায় থাকবো কথা কইবার জন্যে।" সে তার কাছে বসে রইলো—যুবকের উপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'য়ে রইলো। শেষ পর্যন্ত সে আর স্থির থাকতে পারলে না ; কাছাকাছি কেউ নেই দেখে সে ঠিক করলে যুবকের ঘুম ভাঙ্গাবে ঃ

—আমায় ক্ষমা কোর—তোমাকে আমার ভারী আশ্চর্য লাগছে।

—'কেন ?' জিজ্ঞেস করলে ইয়াং-সো-ইয়েয়ী।

—তুমি পথের ধারে এমন করে ঘুমচ্ছ কেন ?

—পরিশ্রান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

—কোথায় থাক ?

—জেন-জু'তে ; এখন রাজধানীতে যা'বো।

—রাজধানীতে ? কিন্তু তুমি তো ঠিক পথে আসনি !

—আমি কি তবে পথ ভুল করেছি ? তা হ'লে কি হ'বে ? হতভাগী স্ত্রীলোকের চোখে জল টলমল করে উঠলো।

—এমন করে একলা একলা পথে বার হওয়া তোমার মোটেই উচিত হয়নি।

—তা জানি ; কিন্তু উপায়ও তো কিছু নেই, আমি অনাথ।

—আমার সঙ্গে আসবে ?

—যেতে পারি, কিন্তু তোমার কাছে তো বেশি দিন থাকতে পারব না।

এই কথার পর পথিক দু'জন 'রো-জা'র মন্দিরের দিকে এগিয়ে চললো।

প্রধান সেবাদাসী উৎ-পুং রাজী হ'লেন যুবক পথিককে স্থান দিতে ; কিন্তু বলে দিলেন দু' তিন দিনের বেশি তাকে মন্দিরে থাকতে দিতে পারবে না—কারণ পুরুষ মানুষকে এ মন্দিরে বেশি দিন থাকতে দেওয়ার রীতি নেই।

ইয়াং-সো-ইয়েয়ী দু'তিন দিনের বেশি থাকতেও চায় না। চেং-শী তার জীবনের সকল ঘটনা ইয়াং-সো-ইয়েয়ীকে বললে। তার কথা শুনে ইয়াং-সো-ইয়েয়ী তার নতুন বন্ধুর সঙ্গে এক সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলে।

পরের দিন সকালে, চেং-শী পথিকের ঘরে এসে টেবিলের উপর একটি আংটী দেখে, তা ভালো করে পরীক্ষা করতে লাগলো। হঠাৎ সে বলে উঠলো ঃ

—দেখ, আমি হয়তো বড় বাড়াবাড়ি করছি—কিন্তু আমায় বলবে কি, এ আংটি তুমি কোথা থেকে পেলে ?

—আমার বন্ধুর স্মৃতিচিহ্ন।

—সে বন্ধু কোথা ?

—রাজধানীতে। তার কাছেই আমি চলেছি—আশা আছে শীঘ্রই তার সঙ্গে মিলিত হব।

—তার কত বয়েস ?

—আমাদের বয়েসের প্রায় সমান। কিন্তু এত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছ কেন ?

চেং-শী চট করে উত্তর দিতে পারলে না। অশ্রুতে তার চোখ দুটো ফুলে উঠেছে। হঠাৎ সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

—পুত্র! আমার পুত্র! কোথায় তুই ?

এই কথায় ইয়াং-সো-ইয়েয়ী ভীষণ ভাবে আহত হ'লো। তবে কি স্ত্রীলোকটি আমার প্রিয়তমের মাতা!

সে ধীরে ধীরে তার হতভাগ্য সঙ্গিনীকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে ঃ

—তোমার পুত্রের নাম কি শান-সিয়েং ?

এই নাম শুনে চেং-শী অতিমাত্রায় বিচলিত হ'য়ে বলে উঠলো ঃ

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ নামেই আমি আমার পুত্রকে প্রথম ডেকেছিলাম। আমার পুত্রের বাহুর পরে লিখে দিয়েছিলাম অমোচনীয় অক্ষরে শান-সিয়েং এর নাম। আর ঐ আংটিটি একটি সুতোয় বেঁধে, তাকে পরিত্যাগ করবার পূর্বে পুত্রের গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম।

—মা, মা, আমার মা—এই কথা বলে ইয়াং-সো-ইয়েয়ী চেংশীর বুকে ঝাপিয়ে পড়লো—তোমার পুত্রই আমার স্বামী। তারই খোঁজে আমি বার হ'য়েছি।

—সত্যি! আমি শুনতে ভুল করছি না তো!—কিন্তু তোমার এ পোশাক কেন ?

—নির্ভয়ে ভ্রমণ করতে পারব বলে এই বেশ ধরেছি।

উভয়ে উভয়কে বুকে জড়িয়ে ধরে উত্তপ্ত অশ্রু বর্ষণ করতে লাগলো! উৎ-পুং এই সময় সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের ক্রন্দনের শব্দ তার কানে এলো। সে ঘরে প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করলো :

—তোমরা এমন করে কাঁদছ কেন?

—প্রিয় ভগিনী, যাকে আমরা মন্দিরে স্থান দিয়েছিলাম সে যুবক নয়—সে আমার পুত্রবধূ ইয়াং-সো-ইয়ায়ী।

—শুনে ভারি আনন্দ হ'লো।

ইয়াং-সো-ইয়ায়ী কেন যে পুরুষের বেশ ধরেছে তা সেবাদাসীকে জানালো।

—ঠিকই করেছ। কিন্তু দেশ ছাড়লে কেন?

ইয়াং-শো-ইয়েয়ী সব কথা তাকে বললো। এখন সে তার স্বামীর সঙ্গে মিলবার আশায় আকুল।

—তাকে আমি সহজেই খুঁজে পাবো, যতই তার পরিবর্তন হ'ক না কেন। চলে যাবার সময় যে ঘোড়াটা তাকে দিয়েছিলাম সে ঘোড়াটা হয়তো সে রেখে দিয়েছে। ঘোড়াটাকে দেখলেই আমি চিন্‌তে পারবো।

—"বেশ! তোমার সকল দুঃখের হয়তো এবার শেষ হ'য়ে এসেছে। তোমার মায়ের সঙ্গে যাও।' সেবাদাসী চেং-শীকে বললে, 'তুমি শান-সিয়েংকে খুঁজে পাবে।'

—হ্যাঁ, আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবো আমাদের কার্য সম্পন্ন করতে।

এতদিন তারা একসঙ্গে ছিল—এবার পরস্পরকে ছেড়ে যেতে, উৎ-পুং আর চেং-শীর হৃদয় দুঃখে ভরে উঠলো। প্রথমে উৎ-পুং

চেং-শীকে পরামর্শ দিলে তার পুত্রবধূর সঙ্গে যাবার জন্যে। তার মনে খুবই কষ্ট হ'চ্ছিল কিন্তু তার বন্ধুর সৌভাগ্যের কথা ভেবে তারও আনন্দ হ'চ্ছিল।

চেং-শী এবং ইয়াং-সো-ইয়েয়ী পথে বার হ'য়ে পড়লো। তারা যখন বাঁশবনের কাছে এসে পড়লো, শান-সিয়েং এর মা অশ্রু ধরে রাখতে পারলে না।

—মা, তুমি কাঁদছ কেন?

—ঐখানে মা, আজ সতের বছর হ'লো, তোমার যে স্বামী, তাকে আমি জন্ম দিয়েছিলাম। এখান থেকে কিছু দূরে আমি তাকে পথের ধারে ফেলে রেখে বোন উৎ-পুং এর সঙ্গে যাই। এই সব স্মৃতির ঘায়ে আমার বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠছে।

স্ত্রীলোক দুজন রাস্তা চলতে লাগলো। কিছুক্ষণ চলবার পর তারা একটা বড় হ্রদের কাছে এসে পড়লো। সেই হ্রদের ধারে চেং-শী দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চোখ তুলে চিৎকার করে বল্‌লে—হতভাগ্য বন্ধু আমার—তোর কি হ'লো!

সে ইয়াং-সো-ইয়েয়ীকে বললে সেই বৃদ্ধার স্বর্গীয় ভালবাসার কথা, যা'র জন্যে সে শু-রুং এর কবল থেকে উদ্ধার পেয়েছিল।

নির্বিঘ্নে তারা এগিয়ে চললো। ক্রমশ তারা সাউগ-ইউ দেশে এসে পড়লো। পরিশ্রমে শ্রান্ত হ'য়ে পড়ে তারা ঠিক করলে এ শহরে কয়েকদিন বিশ্রাম করবে। চটিতে প্রথম তারা উঠলো।

চটিওয়ালার ছেলের দেরী হ'লো না ইয়াং-সো-ইয়েয়ীর প্রেমে পড়তে। কিন্তু ইয়াং তার প্রেম প্রত্যাখ্যান করলে। ছেলেটি ঠিক করলে এ প্রত্যাখ্যানের প্রতিশোধ সে নেবে। সে একজন পরিচারিকাকে রাজী করালে ইয়াং-এর ঘরে কতকগুলি গহণা লুকিয়ে রাখবার জন্যে।

কাজটা খুব সহজেই সম্পন্ন হ'লো। পরিচারিকা প্রতিজ্ঞা করলে, এ কথা সে কারুর কাছে প্রকাশ করবে না।

পরের দিন প্রত্যাখ্যাত প্রেমিক ইয়াং এর ঘরে গিয়ে বললে ঃ

—আমায় ক্ষমা করবেন। আমার কতকগুলি গহণা চুরি হ'য়ে গেছে। বাড়ীর সব ঘরেই আমি অনুসন্ধান করেছি—আপনার ঘরখানা খুঁজে দেখবার জন্যে দয়া করে অনুমতি দিন।

—নিশ্চয়! আপনি খুঁজে দেখুন।

স্ত্রীলোক দুজন বড় কম আশ্চর্য হ'লো না, যখন তারা দেখলে যুবক যেন যাদুকরের মত তাদের ঘর থেকে তার হারানো অলঙ্কার খুঁজে বার করলে। তারা শপথ করে বললে, তারা নির্দোষ; কিন্তু সবই বৃথা হ'লো। শীঘ্রই কয়েকজন চীনা পুলিশ এলো তাদের বন্দী করতে। তাদের কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দিতে হ'লো।

স্ত্রীলোক দুজন খুব জোর করেই বললে তারা নির্দোষ। চীনা কর্মচারী তাদের কথা শুনলো। সেও মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলো ইয়াং-সো-ইয়েয়ীর রূপ দেখে। তার মনের ভাব কিছু জানতে না দিয়ে সে হুকুম করলে স্ত্রীলোক দুজনকে কারাগারে বন্দী করতে। কয়েক মিনিট পর সে তাদের বলে পাঠালে—যদি ইয়াং তাকে বিয়ে করতে রাজী হয় তাহ'লে, তাদের চুরি সম্বন্ধে কেউ আর কোন কথা উত্থাপন করবে না।

যুবতী স্ত্রীলোকটি ঘৃণার সহিত বললে।

—গিয়ে বল্‌গে তোর প্রভুকে যে সে ঘৃণিত, পাপী। আমার বিয়ে হ'য়ে গেছে; আমি আমার স্বামীকে প্রতারিত করতে পারব না—মৃত্যু বরণ করতে হ'লেও নয়।

চীনা কর্মচারী ভীষণভাবে রেগে গিয়ে হুকুম দিলে—দুদিনের মধ্যেই

স্ত্রীলোক দুজনের ফাঁসী হ'বে। কারাগারের প্রহরী, সেই হ'লো জহ্লাদ। সে ফাঁসীর তোড়জোড় করতে লাগলো। এই হতভাগ্য স্ত্রীলোক দুজনের অবস্থায় সে ভীষণ ভাবে আহত হ'য়েছিল। সে স্ত্রীলোক দুজনকে বললে ঃ

—তোমাদের যদি কিছু প্রয়োজন থাকে আমায় বল, আমি তা করতে রাজী আছি। হুকুম মত কাজ করতে আমি বাধ্য, কিন্তু এই চীনা কর্মচারীরা যে ভীষণ বদ লোক, তা আমি বলতে ভয় করি না।

এই কথা বলতে বলতে কারাগারের প্রহরী অশ্রুবর্ষণ করতে লাগলো। চেং-শী ও তার পুত্রবধূ অসীম নিরাশায় আক্ষেপ করতে লাগলো। এমনি ভাবে তাদের জীবন নষ্ট হ'বে—একজন তার স্বামীর সঙ্গে আর দেখা করতে পাবে না, আর একজনের আর দেখা হ'বে না তার পুত্রের সঙ্গে! তারা চিৎকার করে কেঁদে উঠলো ঃ

—শান-সিয়েং, আমার শান-সিয়েং!

বেদনায় তারা জ্ঞান হারালো।

## নয়

শান-সিয়েং রাজধানী ছাড়লো তিনটি উদ্দেশ্য নিয়েঃ প্রথম রাজার আদেশ সম্পাদন করা; তারপর পিতামাতাকে খুঁজে বার করা এবং স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হওয়া। তার উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাজ করা যে কত কঠিন তা সে জানত। কিন্তু তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তার চেষ্টা সফল হ'বে।

প্রথম শান-সিয়েং চললো প্রেমময়ী ইয়াং-সো-ইয়েয়ীর সঙ্গে দেখা করতে। জেন-জু শহরের সন্নিকটে এসে শান-সিয়েং শুনলো, বিদ্রোহে সে শহরে রক্তের বন্যা বইছে। সঙ্গে সঙ্গে নূতন সেনাপতি, কাছাকাছি শহর থেকে সৈন্য আনিয়ে জেন-জু শহরে শান্তি স্থাপন করলে। যে চীনা শাসনকর্তার অত্যাচারের ফলে এই বিদ্রোহে তাকে বন্দী করা হয়েছিলো, তাকে রাজধানীতে পাঠানো হ'লো প্রহরীদের সঙ্গে।

কর্তব্য শেষ হ'লে, ইয়েং-সো-ইয়েয়ীকে হঠাৎ দেখা দেবার জন্যে প্রস্তুত হ'তে লাগলো। হায়! যে বাড়ীতে সে তার স্ত্রীর দেখা পাবে আশা করেছিল, দেখল সে বাড়ী পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে। বেদনায় আকুল হ'য়ে সে কেঁদে উঠলো। তার সঙ্গের প্রহরী তাকে বৃথা সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলে। শান-সিয়েং বেদনায় পাগল হ'য়ে নিজেকে প্রহরীর হাতে ছেড়ে দিলে। সে শুনলো ইয়াং-সো-ইয়েয়ীর মা মারা গেছে, এবং অগ্নিকাণ্ডের সময় মেয়েটি যে কোথায় পালিয়েছে, তা কেউ বলতে পারল না।

শান-সিয়েং ঠিক করলে অবিলম্বে সে তার স্ত্রীর খোঁজে বার হ'বে; কিন্তু শ্রমে সে একেবারে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল; তাই সে বাধ্য হ'লো

কয়েকদিন বিশ্রাম করতে। একদিন সে তৃতীয়বার শান-হুনিকে স্বপন দেখলে। শান-হুনি তাকে বললে ঃ

হতভাগ্য পুত্র, তুই তোর জননীকে খুঁজে মরছিস, কিন্তু খুঁজে পাচ্ছিস না। শোন তবে, আমিই তোর পিতা। এক সময় রাজসভায় আমার অগাধ প্রতিপত্তি ছিল। আমার শত্রু জা-জীও-মি আমায় দ্বীপান্তরে পাঠায়; সেই সঙ্গে দ্বীপান্তরিত হয় আমার বন্ধু সুন-ইয়েন। শু-রুং আমায় কো-কুম-টোর পথে নিয়ে যেতে যেতে হত্যা করে। তোর মা আর তোর স্ত্রী এখন সাউগ-ইউ শহরে। একজন শয়তান চীনা কর্মচারী তাদের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দিয়েছে। শীঘ্রই গিয়ে তাদের সাহায্য করগে। বিন্দুমাত্র দেরী হ'লে সমূহ বিপদ।

শান-সিয়েং ঘুম ভেঙ্গে উঠে অনতিবিলম্বে ছুটলো সাউগ-ইউ শহরের দিকে। শীঘ্রই সে সেই শহরে এসে পড়লো। তার মা ও তার স্ত্রী যে মিছামিছি অভিযুক্ত হয়ে কারাগারে রয়েছে, এবং কাল সকালে যে তাদের ফাঁসী হবে, এসব ব্যাপার সহজেই সে জানতে পারলে।

যুবক ছুটলো কারাগারে। সেখানে প্রবেশ করা অসম্ভব হলো তার। সে একটা মতলব ঠিক করলো। একটা ব্যবসাদারের দোকানে প্রবেশ করে কিছু একটা জিনিস চুরি করে পালাবার ভান করলো। শেষে বন্দী হ'য়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হ'লো।

এই মতলব করবার আগে সে তার সাথীকে বলে রেখেছিল, পরদিন প্রত্যূষে ঘোড়া নিয়ে কারাগারের দ্বারে যেন সে অপেক্ষা করে।

একটা ভীষণ অন্ধকার ঘরে যুবককে বন্দী করে রাখা হলো। এই ঘরের ভিতর আরও অনেক ব্যক্তিকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল— কিন্তু অন্ধকারে কেউ কারুর মুখ দেখতে পাচ্ছিল না। সে কয়েক জনের সঙ্গে ভীষণ গোলমাল করতে লাগলো আলোর জন্যে-- গোলমাল শুনে প্রহরী এসে হাজির হলো। প্রহরী এসে বল্‌লে ঃ

—দাঁড়াও, আমি চীনা কর্মচারীকে খবর দিচ্ছি। তোমার নাম কি ?—প্রহরী জিজ্ঞেস করলে শান-হুনির পুত্রকে।

—শান-সিয়েং।

এই নাম শুনে ইয়েং-সো-ইয়েয়ী আর চেং-শী যারপরনাই আশ্চর্যান্বিত হ'য়ে গেল। তারা চুপি চুপি বলাবলি করতে লাগলো —"আমার ছেলের তো ঐ নাম"—চেং-শী বললে, কিন্তু এখানে সে নিশ্চয় আসবে না, সে তো চোর নয়।"

রাত কেটে গেল। শান-সিয়েং স্ত্রীলোক দুজনকে চিনতে পারলে। হঠাৎ সকলের কানে এলো হ্রেষা ধ্বনি। ইয়াং-সো-ইয়েয়ী কারাগারের ছোট জানালার কাছে এসে বাহিরের দিকে তাকিয়ে দেখে চিৎকার করে উঠলে।

—মা, মা, দেখবে এসো ? ঐ ঘোড়াটা। যার হ্রেষারব আমার কানে এলো, ওটা আমার স্বামীকে আমি দিয়েছিলাম—ঠিক সেই ঘোড়াটার মত দেখতে ঐ ঘোড়াটি।

চেং-শী উত্তর দিলে :

—হায় ! কে জানে কোথা আমার পুত্র।

শান-সিয়েং তার মার কাছে এগিয়ে জিজ্ঞেস করলে তার দুঃখের কারণ কি। শান-হুনির সঙ্গে দ্বীপান্তরে যাওয়া থেকে আরম্ভ করে বন্দী হয়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়া পর্যন্ত সকল কথা সে বল্‌লে।

যুবকও তার জীবনের সব ঘটনা বল্‌লে—"এই দেখ আমার বাহুতে শান-সিয়েং-এর নাম অঙ্কিত—কিন্তু আমি জানি না কে আমার হাতে এ নাম এঁকে দিয়েছে।

ইয়েং-সো-ইয়েয়ী চিৎকার করে জিজ্ঞেস করে উঠলো :

—তোমার স্ত্রীর নাম কি ? কোন্ দেশে তার বাস ?

—তার নাম ইয়েং-সো-ইয়েয়ী। তার বাস ইউ-জু শহরে। কিন্তু আমি দেখে এলাম তার বাড়ী পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে।

—"আমার প্রিয় শান-সিয়েং—শেষে তা হলে তোমায় আমি খুঁজে পেলাম।" এই কথার পর যুবতী চেং-শীকে বল্‌লে :

—মা, এই তো তোমার ছেলে।

তিনজনে পরস্পরকে বুকে চেপে ধরে অঝোর ধারায় অশ্রুবর্ষণ করতে লাগলো। স্ত্রীলোক দুজনের মনে তখনও নিদারুণ দুঃখ। সৌভাগ্যের স্পর্শ পেয়েও তাদের অবিলম্বে মরতে হবে। শান-সিয়েং তাদের সান্ত্বনা দিলে। তার অসীম ক্ষমতা—এখনই সে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করবে।

এই সময়ে সেনাপতি সঙ্গীর কারাগারে প্রবেশ করছিল। তাকে হুকুম করা হলো দেশময় ঘোষণা করতে রাজপ্রতিনিধি সে শহরে এসেছেন। আর, চীনা শাসনকর্তার হাতে হাতকড়ি দিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করা হক।

কয়েক মুহূর্ত পরেই শান-সিয়েং এর সঙ্গী এসে জানালে তার আদেশ পালন করা হয়েছে। আর আর কর্মচারীরা তার কাছে ছুটে এলো—সকলে শান-সিয়েংকে অভিনন্দন জানালে। তাদের সুমুখে শান-হুনির পুত্র, তার মা ও তার পত্নীকে নিয়ে কারাগার থেকে বার হ'য়ে এলেন।

ইয়াং-সো-ইয়েয়ী সাহসী ঘোড়াটাকে দেখে ছুটে গেল তাকে আদর করতে। ঘোড়াটাও যেন সব বুঝতে পারলে—সে মেয়েটির পানে সজল নয়নে চেয়ে রইলো।

—কাঁদিস নি—আমি যাকে ভালোবাসি সব সময় তার সঙ্গে তুই তো আমার চেয়ে সুখী ছিলি।

শান-সিয়েং এই দৃশ্য দেখে তার স্ত্রীকে বুকের উপর টেনে তার চুলের উপর চুম্বন করলে।

—আর আমাদের বিচ্ছেদ হ'বে না।

শান-সিয়েংএর আনন্দের আর সীমা নেই। এখন তার ইচ্ছে হলো তার পিতার খোঁজ নেয়। চেং-শী তুই চোখের জলে ভাসতে ভাসতে হতভাগ্য শান-হুনির ভাগ্যের কথা তাকে সব বললে।

—তুমি দুঃখ করোনা মা। এত বেদনার পর এই বার তুমি সুখ পাবে। তোমাকে সুখী করবার জন্যে যা কিছু প্রয়োজন সবই আমি করবো। এখন চল, আগে ভগিনী উৎ-পুং-এর সঙ্গে দেখা করে আসি, তোমার জন্যে সে অনেক কিছু করেছে।

এ কথায় চেং-শী'র খুব আনন্দ হলো। তারা সকলে 'রো-জা'র মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেল। হ্রদের ধার দিয়ে যেতে যেতে বৃদ্ধার জীবন বিসর্জনের কথা চেং-শী শান-সিয়েংকে জানালে।

—মা, আমার ইচ্ছে এখানে একটা স্মৃতি-মন্দির গড়ে দি, সেই হতভাগ্য স্ত্রীলোকের স্বর্গীয় প্রেমকে চিরস্মরণীয় করে রাখবার জন্যে।

সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতি-মন্দির তৈয়ারীর জন্য তোড়জোড় চলতে লাগলো।

রোজার মন্দিরে পৌঁছবার পূর্বে বাঁশবনের কাছে দাঁড়িয়ে চেং-শী শান-সিয়েংকে বল্‌লে—'কত দুঃখের মধ্যেই না সেখানে তোর জন্ম হয়েছিল।'······

ভগিনী উৎ-পুং তাদের সাদরে সম্বর্ধনা করলে। "এই দেখ আমার পুত্র"—বল্‌লে চেং-শী।

শান-সিয়েং সেবাদাসীকে অজস্র ধন্যবাদ দিল।

—"আমায় ধন্যবাদ দিও না। একজন হতভাগীকে আশ্রয় দিয়ে আমি আমার কর্তব্য করেছি। ভগবান বুদ্ধই তার এই বিলম্বিত প্রতীক্ষাকে পুরস্কৃত করেছেন।"

হ্রদের ধারে একটা মন্দির উঠলো। একখানা প্রস্তরফলকে

লেখা হলো—"আমার মায়ের প্রাণরক্ষাকারিণীর উদ্দেশ্যে আমার চিরকৃতজ্ঞতার নিদর্শন।"

শান-সিয়েং হুকুম করলে শু-রুংকে ধরে আনতে, আর তার ধনরত্ন সব কেড়ে নিতে।

সেই সময় শু-রুং তার ভাই শু-ইয়েংকে বল্‌লে যে সে এক ভীষণ স্বপ্ন দেখেছে। 'তার মাথাটা যেন একটা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের ভিতর প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

শু-ইয়েং বল্‌লে, "তোমার জীবন শেষ হয়ে এসেছে ; প্রজার ইচ্ছায় তোমার মৃত্যু হবে।"

এমন সময় তাদের দ্বারে কে আঘাত করলো। কয়েক মুহূর্ত মধ্যেই শু-রুংকে বন্দী করে তার ধনরত্ন সব কেড়ে নেওয়া হলো।

সেনাপতির কাছে ডাকাতটাকে নিয়ে আসা হলো। সেনাপতি জিজ্ঞেস করলে :

—আমার নাম শান-সিয়েং। আমায় চিনতে পারো ?

শু-রুং অবাক হয়ে চেয়ে রইল শান-সিয়েং এর পানে। সে বিশ্বাস করতে পারলো না, তার পালিত পুত্রই রাজপ্রতিনিধি হয়েছে।

—তোমার নাম আমার অজানা নয়। আমার পুত্রের নামও শান-সিয়েং।

—তোমার ছেলে আছে তা হলে !

—হ্যাঁ। আজ তিন বছর হলো সে আমায় ছেড়ে গেছে, তার কোন খোঁজই আমি আর পাইনি।

—তাহ'লে শোন। তুমি যার বাপ হবার গর্ব করছ আমি সে-ই। আমি হত্যাকারীর পুত্র নই। আমার মাকে খুঁজে পেয়েছি। তিনি আমার জন্ম-বৃত্তান্ত ও তোমার কুকাজের কথা সবই আমায় বলেছেন।

আমার মাকে তুমি চিনতে পার কি?—সে চেং-শীকে দেখিয়ে শু-রুংকে জিজ্ঞেস করলো।

চেং-শী এতক্ষণ শু-রুং-এর দিকে চেয়ে ছিল। সে চিৎকার করে বলে উঠলো ঃ

কি!··· তুই এখনও বেঁচে আছিস্। ভগবানকে ধন্যবাদ যে আমার প্রতিহিংসার জন্যে তিনি তোকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। বাছা, এই তোর বাপের হত্যাকারী। তুই নিজের হাতে ওকে হত্যা কর। আমি ওর যকৃত ভক্ষণ করতে চাই।···

শান-সিয়েং এর মা পাগলের মত হয়ে গেল। শান-সিয়েং মাকে জানালে—রাজার আজ্ঞা ভিন্ন সে কারুর প্রাণ নিতে পারে না।

শু-রুংকে রাজধানীতে পাঠানো হলো। শান-সিয়েং শু-ইয়েংকে বললে ঃ

—তুমি রাজভক্ত প্রজা। তোমার ভাই অন্যায় করে যে সমস্ত ধনরত্ন সঞ্চয় করেছিল, সে-সব তুমি নাও।

—তোমায় ধন্যবাদ। আমার কিছু প্রয়োজন নেই—আমি আমার ভায়ের সঙ্গে মরতে চাই।

—আমি বুঝতে পারছি তোমার মনের ইচ্ছে।

—একটা গাছ কাটলে তার শাখা-প্রশাখা কি বেঁচে থাকতে পারে? —বললো শু-ইয়েং।

—কিন্তু তোমার ভাই পাপী—তোমার নিজের উপর তো আমাদের কোন অভিযোগ নেই!

—তা সত্যি—সেই জন্যে আমি আমার ভায়ের সঙ্গে একত্রে মরতে চাই না।

শান-সিয়েং সব কাজ শেষ করে রাজধানীতে ফিরল। সম্রাজ্ঞী

সমুদয় কথা শুনতে চাইলেন। শান-সিয়েং সব কথা বলে চুপ করলে চেং-ই কাঁদতে কাঁদতে বললো :

—তুমি আমার চেয়ে সুখী।

এই কথা বলে রাণী অচৈতন্য হ'য়ে পড়লেন। তাঁর জ্ঞান হ'লে শান-সিয়েং জানতে চাইলো তাঁর দুঃখের কারণ কি।

—হায়! আজ তিন বছর হ'লো আমি আমার পিতাকে হারিয়েছি ; তার কোন সংবাদ আজ পর্যন্ত নেই।

সেনাপতি বললেন সে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে তাঁর পিতাকে খুঁজে বার করবার। রাণী হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন :

—রাজ্যের সমস্ত অন্ধকে একটা উৎসবে আমন্ত্রণ কর। আমি সকলকে কিছু কিছু পুরস্কার দিতে চাই।

—মহারাণী আপনার আজ্ঞা পালন করা হ'বে।

সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠানো হ'লো কোরিয়ায় সকল অন্ধকে আমন্ত্রণ করবার জন্যে।

## দশ

অনেক মাস কেটে গেছে, হতভাগ্য স্থন-ইয়েন ভাঙ্গা বুকে বাধ্য হ'য়ে বিদায় দিয়েছে তার কন্যাকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে জীবন বিসর্জন দেবার জন্যে। অতি কষ্টে তার জীবন কাটছে—তার একমাত্র আশা, সেবায়েতের কথা অনুযায়ী সে তার দৃষ্টি ফিরে পাবে। এই আশা অবলম্বন করে এমনি করে তিন বছর কেটে গেল। হায়! তিন বছর তো কেটে গেল, জা-জীও-মির বন্দী তো তার দৃষ্টি ফিরে পেলো না। অসীম তার দুঃখ। এখন সে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে কখন মৃত্যু এসে তার সকল বেদনা হরণ করবে।

একদিন স্থন-ইয়েনের বাড়ীতে এক চীনা কর্মচারী এসে উপস্থিত হ'লো। স্থন ভয় পেয়ে গেল। কর্মচারী বললে:

—মহারাজ তার রাজ্যের সকল অন্ধকে একটা উৎসবে নিমন্ত্রণ করেছেন। তোমায় রাজধানীতে যেতে হ'বে।

—এতদূর যা'বার মত ক্ষমতা আমার নেই—আমার বাড়ীর সমুখেই আমি কয়েক পা হাঁটতে পারি না।

—তোমার ভাবনা নেই—আমি তোমায় একটা ঘোড়া আর একজন সঙ্গী দেব।

—তোমায় ধন্যবাদ—কিন্তু কেন মিছে এত খরচ করা।

—রাজার আদেশ। সব প্রস্তুত, তুমি এখনি যাত্রা শুরু করতে পার।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্থন-ইয়েন চললো। কয়েক দিন পর সে রাজধানীতে এসে হাজির হ'লো।

শান-সিয়েং এর আদেশে এক বিরাট উৎসবের আয়োজন হ'য়েছে।

একজন নামকরা স্ত্রীলোক ভার নিয়েছেন আগত অন্ধদের যত্ন নেবার জন্যে। সে তাদের উপরে লক্ষ্য রেখেছে—দৃষ্টিহীনতার জন্যে অন্ধেরা ভীষণ মুস্কিলে পড়ছে। উৎসব প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে, এমন সময় সুন-ইয়েন উপস্থিত হ'লো সে উৎসবে। কয়েকজন ভৃত্য তাকে স্ত্রীলোকটির কাছে নিয়ে এলো। স্ত্রীলোকটি বৃদ্ধকে দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলে। স্ত্রীলোকটি বৃদ্ধকে তার নোংরা অবস্থার কথা জানালো। সুন-ইয়েন বললে ঃ

—আমি জানি তুমি যা বলছ। আমার কয়েকটি কথা শোনো ঃ—

"প্রত্যেকের কাছে প্রত্যেকে বিভিন্ন—কিন্তু রুচি সকলের সমান।

"যারা শয়তান তারা সুন্দর রূপের দ্বারা তাদের শয়তানী লুকিয়ে রাখে।

"বুদ্ধিমান লোক রূপের চেয়ে গুণ পছন্দ করে—বাইরের রূপের চেয়ে ভিতরের রূপকে দেখে ভালো করে।

"তোমার একটা আপেল দেখে লোভ হয়, কিন্তু তার ভিতরে পোকা দেখলে আপেলটি তুমি খেতে চাওনা।

"কেবল, আকাশ যেমন তেমনিই আমরা দেখি। আকাশ সব সময়েই সুন্দর।

"শিষ্য আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে, কারণ সে তার গুরুর পদ নিতে চায়।

"আমি গাছ পুঁতেছিলাম; তাতে একটি ফুল ফুটেছিল; কি সুন্দর ফুল! হঠাৎ হাওয়া এসে ফুলটিকে উড়িয়ে নিয়ে ফেল্‌লে সমুদ্রের বুকে। ফুলটা ভাবে, যে গাছে সে ফুটে ছিল সে গাছের কথা। গাছটা কিন্তু ফুলটাকে হারিয়ে দুঃখে দুঃখে শুকিয়ে যেতে থাকে।

"মনে হয় অর্ধচন্দ্র সমুদ্র থেকে ওঠে। কিন্তু মাছেরা ভয় পেয়ে যায়—কারণ ওরা ভাবে একটা বিরাট বঁড়শী তাদের গাঁথতে আসছে।

"প্রতি মাসে কয়েক দিনের জন্যে চাঁদ দেখা দেয় না—কিন্তু চাঁদিনীতে আবার ধরণী উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। আমি কিন্তু আর দৃষ্টি ফিরে পেলাম না।

"আজ তিন বছর আমার চোখে জল ঝরছে, বৃষ্টিধারার চেয়ে বেশি। রাতের বেলা গাছের পাতার মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া হাওয়ার নিশ্বাস অপেক্ষা আমার দীর্ঘশ্বাস বেদনাময়।"

শেষ অন্ধ বললে ঃ

—যদি আমার মলিনতায় তোমার ঘৃণা হয় তা হ'লে এক কোণে আমায় ফেলে রাখো।

বৃদ্ধের কবিতাময় আর জ্ঞানগর্ভ কথা শুনে স্ত্রীলোকটি অবাক্ হ'য়ে গেল। তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার না করার জন্যে সে ক্ষমা চাইলো। সুন একলা একটি টেবিলে বসে খেতে লাগলো। সেই সময় স্ত্রীলোকটি রাণীর কাছে গিয়ে বৃদ্ধের সব কথা বললো।

এই কথা শুনে চেং-ই অবাক্ হ'য়ে গেল। সে তার মনের কথা স্বামীকে জানালো। তারপর রাণী ইচ্ছে করলেন তার সুমুখ দিয়ে অন্ধেরা একে একে যা'ক।

—প্রত্যেককে আমি কিছু উপহার দেব।

বৃদ্ধ চেং-ইর কাছে এলো। চেং-ই তাকে জিজ্ঞেস করলে ঃ

—তুমি পৃথিবীর বিরুদ্ধে, ধর্মের বিরুদ্ধে, এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এমন বিদ্রোহী কেন?

—কারণ পৃথিবী, ধর্ম এবং রাষ্ট্র আমার সকল দুঃখের কারণ। আমার প্রিয় পত্নী ছিল, তাকে আমি হারিয়েছি। আমি অন্ধ হ'য়েছি। আমার শেষ সম্বল এক মেয়ে, তাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া

হ'য়েছে। আমি দৃষ্টি ফিরে পাব এই প্রতিজ্ঞার উপর বিশ্বাস করে আমার মেয়ে তার জীবন বিসর্জন দিয়েছে—কিন্তু আমার অন্ধত্ব আর ঘুচলো না। হতভাগী মরেছে, কিন্তু আমি আর দৃষ্টি ফিরে পেলাম না।

এই সব কথায় চেং-ই'র মন বিচলিত হ'লো। এই মলিন বৃদ্ধের ভিতর সে যেন তার পিতাকে খুঁজে পেল। সে চিৎকার করে উঠলো ঃ

—তুমি চেং-ইকে চেন ?

—সে তো আমার মেয়ে ! স্থন-ইয়েন উত্তর দিলে।

হঠাৎ যেন তার চোখ খুলে গেল। সর্বপ্রথম সে দেখতে পেলো তার মেয়েকে, যা'কে সে চিরকালের জন্য হারিয়েছে এই ধারণা ছিল।

সেবায়েতের ভবিষ্যদ্বাণী এতদিনে সফল হ'লো। আনন্দের আতিশয্যে পিতা ও কন্যা উভয়ে উভয়কে বুকে জড়িয়ে ধরে রইলো। অশ্রুবর্ষণ করা ব্যতীত আর তাদের কোন শক্তি ছিল না।

এই দৃশ্যে মহারাজ প্রথম হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলেন। ক্রমশ তিনি সব বুঝতে পারলেন। তিনি বললেন, চল আমরা এই উৎসব-ক্ষেত্র ছেড়ে যাই। এ অবস্থায় একটু নির্জনতার প্রয়োজন।

স্বামীকে ও পিতাকে একলা পেয়ে চেং-ই তাদের বংশের ইতিহাস সব রাজাকে বললো।

স্থন-ইয়েনের যেন সব পরিবর্তন হ'য়ে গেছে। মেয়ের কথা শেষ হ'লে সে জিজ্ঞেস করলো ঃ

—কেমন করে তুই মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচলি—রাজাকেই বা কি করে বিয়ে করলি ?

চেং-ই সব ঘটনাই পিতাকে বললো।

—তাহ'লে শান-সিয়েং তোকে বাঁচিয়েছে বল।

—হ্যাঁ বাবা।

—সে কি করে? কোথা সে?

—রাজা তাকে প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত করেছেন। তাকে আমি ডেকে পাঠাচ্ছি।

শান-সিয়েং এলো। সুন-ইয়েন তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বললে ঃ

—আমার প্রাণের বন্ধুর পুত্র! তোমার বাবা কোথা?

—তিনি আর এ পৃথিবীতে নেই। দ্বীপান্তরে নিয়ে যাবার সময় পথেই শু-রুং তাকে হত্যা করে।

—য়্যা! সে মরে গেছে!—চিৎকার করে উঠলো বৃদ্ধ।

উভয়েই কাঁদতে লাগলো। রাজা তাদের ধন্যবাদ দিয়ে সুন-ইয়েনকে বললেন ঃ

—আপনি আমার প্রধান মন্ত্রী হ'বেন?

বৃদ্ধ এ ভার নিতে স্বীকৃত হ'লো।

—এখন চল আমরা উৎসবে ফিরে যাই, রাণী বললো।

অন্ধরা সকলে জানলো কি ব্যাপার ঘটেছে। সকলেই ভাবলো ঃ হায়! তার সুখ দেখবার মত অবস্থাও আমাদের নেই।

তারপর, মহারাজ সব সময়েই সুন-ইয়েনের পরামর্শ নিয়ে রাজকার্য চালান। একদিন তিনি প্রধান মন্ত্রীকে বললেন,—দেখ, আমি জিন-হানের বিরুদ্ধে অভিযান করতে চাই। যে দেশ জয় করতে গিয়ে আমার বাবা হেরে যান, আমি তার শোধ নিতে চাই।

—মহারাজ, আমায় কয়েকদিন চিন্তা করতে দিন।

সেই দিনই শান-সিয়েং প্রধান মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলে, জা-জীও-মি এবং শু-রুং সম্বন্ধে তিনি কি নির্দেশ দেন। সুন-ইয়েন বললেন যে, তার মত দু-এক দিনের মধ্যে জানাবেন।

একা একা-সুন-ইয়েন গভীর ভাবে চিন্তা করতে লাগলেন।···

তার তো কারুর উপর আক্রোশ নেই, তবে কি হ'বে প্রতিশোধ নিয়ে? তারপর যুদ্ধ ঘোষণারই বা প্রয়োজন কি?··এক যুদ্ধই তো আর এক যুদ্ধের জন্ম দেয়।···এই সব কথা চিন্তা করে তিনি মহারাজকে বললেন:

—দেখুন যুদ্ধের পূর্বে প্রজাদের মত নেওয়া উচিত নয় কি?

—নিশ্চয়। কিন্তু কেমন করে প্রজাদের মত নেওয়া যায়?

—কিছুই কঠিন নয়। একটা সভায় প্রজাদের আসতে বলুন। তাদের আমি কয়েকটি কথা বলবো; তারপর একান্তই যদি আপনি যুদ্ধ করতে ইচ্ছে করেন তখন যুদ্ধের ব্যবস্থা করবো।

সুন-ইয়েনের কথা মহারাজ সমর্থন করলেন। সুন-ইয়েন আদেশ করলেন বিরাট এক উৎসবের আয়োজন করতে। নিমন্ত্রিতদের পাঁচ স্তরে বিভক্ত করা হ'বে। রাজবংশীয় ব্যক্তিদের নিয়ে একটি স্তর; প্রদেশপালদের নিয়ে একটি স্তর; তারপর প্রজা, সৈন্য, রাজদ্রোহী ও পাপীর দল। খাওয়া-দাওয়ার পর নিমন্ত্রিতেরা চলে যাবার পূর্বে প্রধান মন্ত্রী দীপ্তস্বরে একটি বক্তৃতা দিলেন:

—আমি প্রধান মন্ত্রী; আমি আপনাদের সকলকে একই প্রশ্ন করতে চাই। মহারাজের ইচ্ছা জিন-হান দেশ জয়ের অভিযান করেন। এই অভিযান কি এখন কোন লাভের হ'বে? আমার মতে যুদ্ধ হ'চ্ছে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ মড়ক। যুদ্ধে ক্ষতির সীমা নির্দেশ করা যায় না। কত নির্দোষ লোক যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যায়। তারপর সৈন্য রাখবার জন্যে অগাধ টাকার প্রয়োজন। কোথা থেকে আসবে এত টাকা যদি নতুন কর না বসান হয়। শান্তির মত পৃথিবীতে আর কিছু নেই। সাধারণের ধন বৃদ্ধি দ্রুতভাবে হ'তে থাকে। মানুষের জন্ম পরস্পরকে ভালোবাসবার জন্যে, পরস্পরকে হত্যা করবার জন্যে নয়। প্রকৃতি কি আমাদের শান্তির

উদাহরণ দেয় না ? পথের উপর যখন দেখি একটা বলবান কুকুর আর একটা দুর্বল কুকুরের উপর অত্যাচার করছে, তখন আমরা স্বভাবতই দুর্বল কুকুরটাকে সাহায্য করি। কেন আমরা পরস্পরের প্রতি অত্যাচার করবো ? কারণ যারা সবল তারা দুর্বলের উপর অত্যাচার করে। কিন্তু আমরা তো জন্তু নই—আমরা অনেক উন্নত জীব—এবং আমাদের বিবেক আছে। এই বিবেকই আমাদের বারণ করে কারুর উপর অত্যাচার করতে। মহারাজ, এই কারণেই আমি যুদ্ধ চাইনা এবং ঐ একই কারণে আমি চাইনা তাদের শাস্তি দিতে যারা আমার উপর বহু অত্যাচার করেছে। তাদের ক্ষমা করুন, এবং তাদের অনুতাপ উদাহরণ স্বরূপ হোক তাদেরই কাছে যাদের মনে পাপ আছে।

সকলে স্থন-ইয়েনের কথা সমর্থন করলো। সকলে বলে উঠলো ঃ "কি সৌভাগ্য আমাদের ! আজ আমরা একত্র হ'য়েছি একটি গাছের ছায়ায়, যে গাছটিকে বসন্ত প্রাণময় করে তুলেছে।" সেই লোকের ভিড়ের মধ্যে থেকে উঠলো স্বদেশের ভবিষ্যতের জন্যে গুরুগম্ভীর প্রার্থনা ঃ

—আমাদের সুদিন এসেছে। চারদিকে সুখের সাড়া পড়ে গেছে। স্থন-ইয়েনের প্রভাবে সকলের মন জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে।

তারপর একদিন প্রধান মন্ত্রী অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন। নিঃসন্দেহে তিনি মেঘের রথে চড়ে তাঁর শেষ এবং সত্যিকারের আবাস স্বর্গে গিয়ে পৌঁছেছেন।